গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৬ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা ৯ জুলাই, ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

সাদ্দাম হুসেনের বিচার-প্রহসনের নিন্দা করল এস ইউ সি আই

গত ১ জুলাই বাগদাদে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনের তথাকথিত যে বিচার শুরু হয়েছে, এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ২ জুলাই এক বিবৃতিতে তার তীব্র নিন্দা করেছেন। কমরেড মুখার্জী বলেছেন, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা গঠিত ইরাকের পুতুল সরকারের সাদ্দাম হুসেনের বিচার করার কোন নৈতিক বা আইনি অধিকারই নেই। রাষ্ট্রসংঘের সনদকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অমান্য করে, নিরাপত্তা পরিষদের মতামতকে ঔদ্ধত্যের সাথে উপেক্ষা করে, আন্তর্জাতিক সমস্ত আইনকে নির্লজ্জভাবে ভঙ্গ করে এবং বিশ্বজনমতকে সদম্ভে পদদলিত করে ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ খোলাখুলি ইরাক-আগ্রাসনের মাধ্যমে সাদ্দাম হুসেনকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। তাই বিশ্বের জনগণ সাদ্দাম হুসেনের নয়, বিচার দাবি করছে কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধী এবং ইরাকের জনগণ তথা বিশ্বমানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধের সংগঠক বুশ এবং ব্লেয়ারের।

সাদ্দাম হুসেনের নিঃশর্ত এবং দ্রুত মুক্তির দাবি পুনরায় ঘোষণা করে কমরেড মুখার্জী, নিজ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের এই মহান রক্ষক এবং মার্কিন আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে মহান যোদ্ধার জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কারণ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত এই বিচারের প্রহসনের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে, যত দ্রুত সম্ভব সাদ্দাম হুসেনকে হত্যা করা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করার জন্য বিশ্বের সমস্ত স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষকে এগিয়ে আসতে কমরেড নীহার মুখার্জী আহ্বান জানিয়েছেন।

ইরাকের জনগণ যোগ্য জবাব দিচ্ছে

ইরাকে আমেরিকার অন্যায় জবরদস্তি দখলদারির গায়ে ভূয়া স্বাধীনতার আবরণ পরাতেই আমেরিকা ইরাকে 'অন্তর্বর্তী সরকার'-এর নামে একটা পুতুল সরকার চাপিয়ে দিয়েছে। বিশ্বজনমতকে দু'পায়ে মাড়িয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ গণবিধ্বংসী অস্ত্র মজুতের মিথ্যা অজুহাতে ২০০৩ সালের ২০ মার্চ দ্বিতীয়বার ইরাক আক্রমণ ও ধ্বংস করে ইরাকের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হরণ করেছিল। তারপর থেকে দীর্ঘ ১৩ মাস ধরে ইরাকি সাধারণ মানুষের উপর মার্কিন-ব্রিটিশ সেনাদের সীমাহীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইরাকের বীর জনগণের প্রবল প্রতিরোধ সংগ্রাম, দখলদার মার্কিন প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যোদ্ধাদের প্রবল প্রতি-আক্রমণে মার্কিন সেনাদের মৃত্যু, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া বিক্ষোভ, এমনকী আমেরিকার অভ্যন্তরেও ইরাকের পক্ষে জনমত শেষপর্যন্ত বুশ প্রশাসনকে কোনঠাসা করে দেয়। ইরাক জয়ের স্বপ্ন মিলিয়ে গিয়ে মার্কিন প্রশাসনে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। ইরাকের উপর দখলদারি বহাল রেখেই কী করে বিশ্বের ও আমেরিকার জনগণের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, সেই কৌশল খুঁজতে ব্যস্ত হয় বুশ সরকার। ইরাককে 'সার্বভৌমত্ব' ফিরিয়ে দেওয়ার নামে পুতুল সরকার তৈরি করা, সেই হীন মতলবেরই ফল।

এই অন্তর্বর্তী সরকার আমেরিকার পছন্দসই

পাঁচের পাতায় দেখুন

ভাড়া বাড়ানোর সময়ই কেবল পরিবহনদপ্তরের দেখা মেলে

তেলের অল্প কিছু দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাসমালিকরা প্রতিবারের মত এবারও ভাড়া বাড়ানোর দাবি তোলা মাত্রই সিপিএম ফ্রন্ট সরকার সর্বনিম্ন স্টেজ বাদ দিয়ে পরবর্তী প্রতি স্টেজে ৫০ পয়সা ও ১ টাকা হারে বাড়িয়ে দিয়েছে। সর্বনিম্ন ভাড়ার দূরত্বও ৬ কিমি থেকে কমিয়ে ৪ কিমি করা হয়েছে। শুধু বাসের ভাড়া নয়, ট্রাম, লঞ্চেরও ভাড়া বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তেলের দামবৃদ্ধির সঙ্গে ট্রামের কোন সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও ট্রামের ভাড়া বাড়ানো হলো কেন, এ প্রশ্নে সরকার নীরব।

গতবারের ভাড়াবৃদ্ধির পর বর্তমান ভাড়াবৃদ্ধির সময় পর্যন্ত ডিজেলের দাম মাত্র ১.৫২ টাকা বেড়েছে। এর জন্য বাসমালিকদের বাড়তি কত টাকা খরচ হচ্ছে? কলকাতায় একটি বাসে সর্বোচ্চ দৈনিক ৫০ থেকে ৬০ লিটারের বেশি ডিজেল খরচ হয় না। লিটার প্রতি ১.৫২ টাকা বাড়তি খরচ ধরলে দৈনিক একটি বাসে তেলের জন্য বাড়তি খরচ হবে ৭৬ থেকে ৯১ টাকা। রাজ্য সরকার নিয়োজিত প্রবুদ্ধ রায় কমিটি হিসাব দিয়েছিল, কলকাতায় একটি বাস সারাদিনে কমপক্ষে ১১০০ যাত্রী বহন করে। এই ৯১ টাকা বাড়তি খরচ তোলার জন্য ১১০০ যাত্রী পিছু বাড়তি ভাড়া আদায় কতটুকু প্রয়োজন? খুবই সামান্য। অথচ ভাড়া বাড়ানো হয়েছে ২০ কিমি পর্যন্ত যাত্রীপিছু প্রতি স্টেজে ৫০ পয়সা এবং ২০ কিমির পর প্রতি স্টেজে ১ টাকা হারে। এই হারে বাড়তি ভাড়া নিলে কী পরিমাণ টাকা ওঠে, সরকার তার হিসাব দেবে কি ?

আটের পাতায় দেখুন

অযৌক্তিক ভাড়াবৃদ্ধির প্রতিবাদে ৫ জুলাই এস ইউ সি আই বিক্ষোভ মিছিল

সরকার-বাসমালিক গটআপ গেম

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৪ জুলাই এক বিবৃতিতে বলেন — "বাস ধর্মঘট রাজ্য সরকার ও বাস মালিকদের 'গটআপ গেম' ছাড়া আর কিছুই নয়। চালাকি করে দেখানো হচ্ছে রাজ্য সরকার যেন যাত্রীস্বার্থে ভাড়া বেশি বাড়ায়নি এবং এতে বাস মালিকরা অসন্তুষ্ট। সমগ্র দেশে ডিজেলের দাম বাড়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র এ রাজ্যে এত দ্রুত ভাড়া বাড়ানো হচ্ছে কেন? অন্যান্য বহু রাজ্যের তুলনায় এ রাজ্যে ভাড়া এত বেশি কেন? ইতিপূর্বে অত্যধিক ভাড়া বাড়ানোর সাফাই দিতে গিয়ে পরিবহন মন্ত্রী বলেছিলেন, বারবার ডিজেলের দাম বাড়লেও যাতে ভাড়া বাড়াতে না হয় তারজন্য এত বেশি বাড়ানো হয়েছে, তবুও এবার বাড়ানো হচ্ছে কেন? এর আগে যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করার নামে ৯% ভাড়া বাড়ানো সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা হয়নি কেন এবং সেই অর্থ কোথায় গেল? নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করে বাস মালিকদের আয়-ব্যয়ের হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ করা হচ্ছে না কেন? রাজ্য সরকারের কাছে এই প্রশ্নগুলির উত্তর আমরা দাবি করছি।"

১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের বিরোধিতা করল গরিব দরদী সিপিএম সরকার

গ্রামোন্নয়ন প্রশ্নে আলোচনার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে গত ২৯ জুলাই প্রধানমন্ত্রী একটি বৈঠক ডেকেছিলেন। তিনি বিপিএল তালিকাভুক্ত গরিব মানুষদের বছরে ১০০ দিনের কাজ গ্যারান্টি করার জন্য একটি প্রকল্প রূপায়ণের ব্যাপারে সকলের মতামত চান। শুনলে অনেকেই আশ্চর্য হবেন, গরিবদের স্বার্থরক্ষার একচেটিয়া দাবিদার সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র এই প্রকল্পের বিরোধিতা করেছেন।

দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষদের বছরে ১০০ দিনের কাজের বিষয়টি সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চার সিএমপি (কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম)-র অন্তর্ভুক্ত। এই সিএমপি-কে সূর্যবাবুদের দল সিপিএম শুধু সমর্থনই করেনি, তাঁদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতেই এটি তৈরি হয়েছিল। সেদিন তাঁরা দেশজুড়ে প্রচার তুলেছিলেন যে, ইতিপূর্বে কোন সরকারই এই ধরনের জনস্বার্থবাহী কর্মসূচি নেয়নি। তাঁরা একথাও বলেছিলেন যে, সংসদে বামপন্থীদের সংখ্যাধিক্য এবং সিপিএমের সক্রিয় ভূমিকার ফলেই বিশ্বায়নের প্রবক্তা কংগ্রেস এই নীতি নিতে বাধ্য হয়েছে। এই নীতির ফলে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার

পাঁচের পাতায় দেখুন

ইভটিজিং-এর প্রতিবাদে রায়গঞ্জে মৌন মিছিল

রাজ্যের অন্যান্য স্থানের মতো উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জেও নানা অসামাজিক কার্যকলাপ, ইভটিজিং, খুনের ঘটনা ক্রমাগত বাড়তে থাকায় এ জেলার সর্বস্তরের মানুষ ব্যথিত-ক্ষুব্ধ। গত ২৭ জুন ভাইঝির প্রতি অশালীন মন্তব্যের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে ইভটিজারদের পাণ্ডার হাতে খুন হলেন রায়গঞ্জ শহরের দক্ষিণ কলেজপাড়ার সৎ সাহসী যুবক পুলক কর। শহরে প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সর্বস্তরের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ভাবতে থাকেন — আর নয়, এখনই কিছু করা উচিত। কিন্তু ভয়-ভীতি, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে কেউই এগিয়ে আসতে সাহস পাচ্ছিলেন না। কলেজ পাড়ার শিক্ষক-শিক্ষিকা-গৃহবধূ-ছাত্রীদের মধ্যে নারীলাঞ্ছনার নানা ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ ব্যক্ত হয়।

পুলকের খুনের পরেই এলাকার বহু ছাত্র-যুব আন্দোলনের পরিচিত নেতা দুলাল রাজবংশী ও মাধবীলতা পাল বিভিন্ন স্তরের মানুষের কাছে দলমত নির্বিশেষে প্রতিবাদে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান। গড়ে ওঠে পুলক করের স্মৃতিতে সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধ (প্রস্তুতি) কমিটি। মাত্র দু'দিনের প্রস্তুতিতেই মৌন মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। ২ জুলাই বিকাল সাড়ে ৪টায় রায়গঞ্জ মোহনবাটী রবীন্দ্রমূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে তিনশতাধিক নাগরিকের মৌন মিছিল দেবীনগর ভারত সেবাশ্রম সংঘের কাছে শেষ হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন রায়গঞ্জ সুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুশীল গোস্বামী, করোনেশন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শুভেন্দু মুখার্জী, ভরতপুর হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সত্যরঞ্জন আচার্য, শ্রীঅগ্রসেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা জয়িতা বসু, নিহত পুলক করের দাদা আশিস কর সহ বহু শিক্ষক-ডাক্তার-নার্স। মিছিলে সামিল হন মেডিকেল সপ্ ওয়ার্কার্স এ্যাসোসিয়েশন, পুলক করের পরিবার ও এলাকার বিভিন্ন ক্লাবের সদস্য ও সাধারণ মানুষ। ৭৮ বছরের প্রবীণ চিকিৎসক সুধীর চন্দ্র দেবনাথও মিছিলে হেঁটেছেন। মিছিলে ছাত্রীদের হাতে ছিল প্ল্যাকার্ড — 'মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে চাই'। বিবেক মনুষ্যত্ব রক্ষার শপথ নেওয়া এই মৌন মিছিল যতই এগিয়েছে, ততই দীর্ঘতর হয়েছে। রাস্তার পাশে বহু মা-বোন দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছেছেন। মিছিল দক্ষিণ কলেজপাড়ায় পৌঁছলে পুলকের বাবা, ৯৫ বছর বয়স্ক স্বাধীনতা সংগ্রামী ও রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক যতীন্দ্রনাথ করকে মিছিল দেখাতে নিয়ে আসেন বাড়ির লোকজন। পুত্রশোকে বৃদ্ধ তখন কাঁদছেন। রায়গঞ্জের জাগ্রত বিবেক গুমরে ওঠা কান্না বুকে নিয়ে মৌন মিছিল থেকে এ কথাই বলেছে — আগামী দিনে কোনো মা-বোনের ইজ্জৎ লুণ্ঠিত হতে দেখে আমরা যেন চুপ করে না থাকি। দাবি উঠেছে, সমস্ত দোষীদের এবং ইভটিজারদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। ছাত্রীদের উপর ইভটিজিং বন্ধ করতে সমস্ত রাস্তায় পুলিশের মোবাইল চেকিং রাখতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে প্রশাসনকে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। মিছিলের শেষে নাগরিক কনভেনশনের প্রস্তুতি নেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়।

পাঠ্যবই সরবরাহের দাবিতে বর্ধমানে ছাত্র বিক্ষোভ

নতুন শিক্ষাবর্ষে দু'মাস পেরিয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত নতুন সিলেবাস অনুযায়ী সব পাঠ্যপুস্তক পাওয়া যাচ্ছে না। যে কয়েকটি বই পাওয়া যাচ্ছে তা নিয়েও চলছে কালোবাজারি। এর প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও'র বর্ধমান

জেলা কমিটির নেতৃত্বে গত ২৬ জুন পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রী সুসজ্জিত মিছিল সহকারে ডি আই অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। এই বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড অনিরুদ্ধ কুণ্ডু, কমরেডস অতীশ বোস, হেমন্ত মালিক, কৃষ্ণ দাস, ঝর্ণা পাল সহ বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র প্রতিনিধিরা। এরপর এক ছাত্র প্রতিনিধিদল ডি আই-এর কাছে তাদের স্মারকলিপি নিয়ে যায়। দাবি করা হয়, অবিলম্বে স্বল্পমূল্যে নতুন বই সরবরাহ করতে হবে, অষ্টম শ্রেণীতে 'জীবনশৈলী শিক্ষা'র নামে যৌন শিক্ষা চালু করা চলবে না এবং মাধ্যমিকে উত্তীর্ণ জেলার সমস্ত ছাত্রের ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

রায়গঞ্জে যুব সমাবেশ

বেকারি, স্বনিযুক্তি প্রকল্পের ভাঁওতা, অপসংস্কৃতি, মদের ঢালাও লাইসেন্স, সাম্প্রদায়িকতা, নারী নির্যাতন ও নারী পাচারের বিরুদ্ধে এবং যুবজীবনের সমস্যাগুলির প্রতিবিধানে ২৬ জুন এ আই ডি ওয়াই ও'র প্রতিষ্ঠা দিবসে উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে রায়গঞ্জ মোহনবাটী রবীন্দ্রমূর্তির পাদদেশে যুবসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড রঞ্জন সরকার। সভার শুরুতে ইভটিজিং-এর প্রতিবাদকারী রায়গঞ্জের যুবক পুলক করের নৃশংস খুনের প্রতিবাদে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন কমরেড সুজয় মল্লিক। সভায় প্রধান বক্তা ডি ওয়াই ও'র রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দীপক ব্যানার্জী তাঁর বক্তব্যে যুব জীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী যুব আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। জেলায় শিল্প স্থাপন করে স্থানীয় যুবকদের কাজ, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে স্বজন পোষণ ও দুর্নীতি বন্ধ, শহরে সুষ্ঠু জলনিকাশি ব্যবস্থা, রায়গঞ্জের মানুষদের জন্য নর্থবেঙ্গল মেডিক্যালে ও কলকাতায় সুলভ যাত্রীনিবাস স্থাপন প্রভৃতি দাবিতে আন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কমরেড বিপ্লব কর্মকার।

কালিয়াচকে যুব সম্মেলন

যুবজীবনের বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যা সহ আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংস্কার ও পূর্ণ সময়ের জন্য ডাক্তার নিয়োগের দাবিতে গত ২০ জুন মালদহের কালিয়াচক থানা যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কামারপাড়া প্রাথমিক স্কুলে। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই মালদহ জেলার ইনচার্জ কমরেড গোপাল নন্দী এবং ডি ওয়াই ও'র রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দীপক ব্যানার্জী। সম্মেলনে কমরেডস্ ধনেশ মণ্ডলকে সম্পাদক, মুকুল মোল্লাকে সভাপতি ও আরিফুল ইসলামকে কোষাধ্য ক্ষ করে ১৫ জনের ডি ওয়াই ও থানা কমিটি সর্বসম্মতিতে গঠিত হয়।

গাজোলে যুব কনভেনশন

এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে দুর্নীতি, অশ্লীল সিনেমা প্রদর্শন, মদের ঢালাও লাইসেন্স প্রদানের প্রতিবাদে ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দাবিতে গত ২১ জুন মালদহ জেলার গাজোল থানার প্রজাপতি লজে ডি ওয়াই ও'র উদ্যোগে যুব কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডি ওয়াই ও'র রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দীপক ব্যানার্জী। থানা জুড়ে দুর্বার যুব আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনে ডি ওয়াই ও-কে মজবুত করে গড়ে তোলার তিনি আহ্বান জানান। কমরেড সুপেন রায়কে আহ্বায়ক করে ১২ জনের গাজোল থানা ডি ওয়াই ও'র প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়।

প্রবীণ পার্টি কর্মীর জীবনাবসান

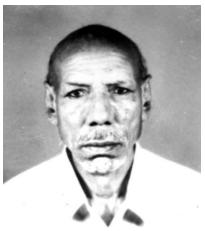

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপ থানার নেতাজীনগর অঞ্চলের শিবনগর গ্রামের কমরেড মোর্তাজা মোল্লা (৬৫) ক্যান্সার রোগের আক্রমণে গত ২৬ জুন বিকাল ৫টায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৯৯ সালে তিনি দলের সাথে যুক্ত হন।

মানুষের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা, সততা ও সরল ব্যবহারের জন্য তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। মৃত্যুর দু'মাস আগে পর্যন্ত দলীয় ও গণআন্দোলনের কর্মসূচিতে সামিল হয়েছেন।

২৭ জুন সহস্রাধিক মানুষের উপস্থিতিতে তাঁর মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়। দলের জেলা ও লোকাল কমিটির সদস্যরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

কমরেড মোর্তাজা মোল্লা লাল সেলাম

জল, স্বাস্থ্য, সার, বীজ, বিদ্যুতের দাবিতে
চন্দনকেয়ারিতে বিক্ষোভ

স্বর্গরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়ে মানুষকে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে নামিয়ে যে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সৃষ্টি, সেই ঝাড়খণ্ড নামের স্বর্গরাজ্যে সাধারণ মানুষ কোন্ জায়গায় আছেন? এক কথায় বিহারের থেকেও খারাপ অবস্থায়। আর এই রাজ্যের স্বর্গে বাস করছেন কারা? মন্ত্রী-আমলা-পুঁজিপতিরা। এদের সাথে আরেক শ্রেণীর মানুষ জড়িয়ে আছে তারা হল ঠিকাদার। সরকারি কোষের সিংহভাগ এদের জন্য। দুর্নীতি এ রাজ্যের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অবস্থান করছে। তাই, এ রাজ্যের মানুষ আজ বিক্ষুব্ধ, আন্দোলনরত। দীর্ঘদিনের শোষণ-বঞ্চনার বিরুদ্ধে নিজেদের অধিকার ফিরে পেতে সঠিক আদর্শের ভিত্তিতে লড়াইয়ে নামলেন ঝাড়খণ্ডেরই বোকারো জেলার চন্দনকেয়ারির মেহনতি মানুষ।

গত ৮ জুন এস ইউ সি আই দলের নেতৃত্বে প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ প্রচণ্ড দাবদাহ উপেক্ষা করে ১২ দফা দাবির ভিত্তিতে বিডিও'র কাছে গণডেপুটেশনে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার দীর্ঘ বছর পর এবং ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠিত হওয়ার প্রায় চার বছর পরও সেখানে পানীয় জলের হাহাকার। নেই চাষের জলের ব্যবস্থা। বৃষ্টি নির্ভর তাদের জীবন। ব্লকে একটা হাসপাতাল, তাতেও আবার একজন ডাক্তার। ওষুধ নেই। জে এস ই বি একবছর আগে বিদ্যুতের জন্য গ্রামের মানুষের কাছে টাকা নেয় — আজও বিদ্যুতের খুঁটি পর্যন্ত গ্রামের মানুষ চোখে দেখতে পাননি। দিনের পর দিন গ্রামের মানুষকে কেরোসিন তেলের জন্য অপেক্ষা করে হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়। সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রবলভাবে ছেয়ে আছে। চাষীদের জন্য যে সার-বীজ ব্লকে আসে তা সঠিক সময়ে সমস্ত চাষীর হাতে আসে না। সচ্ছল ব্যক্তিরা পায় লাল কার্ড, ইন্দিরা আবাস। যাদের পাবার কথা তারা না পেয়ে নিজেদের ভাগ্যের দোষ দেয়। এরই বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মানুষ বেছে নিয়েছেন নিজেদের সংগ্রামের হাতিয়ার এস ইউ সি আইকে।

বেলডি বাঁধ থেকে দাবি সম্বলিত প্ল্যাকার্ড, ব্যানার, ফেস্টুনে সুসজ্জিত বিশাল মিছিল চন্দনকেয়ারি চৌরাস্তায় এলে সেখানে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুণ্ডার কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। এরপর সেখান থেকে মিছিল বিডিও অফিসে যায়। কমরেড রামলাল মাহাতো ও কুমুদ মাহাতোর নেতৃত্বে সাতজনের প্রতিনিধিদল বিডিও'র সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড মদন চ্যাটার্জী, হরিপদ মাহাতো, সতীশ দাস, লক্ষ্মণ মাহাতো, অনিল বাউরী।

ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বিক্ষোভ-সমাবেশ

ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম পশ্চিমবঙ্গ, স্টেট ব্যাঙ্ক শাখার উদ্যোগে ঐ ব্যাঙ্কের আঞ্চলিক হেড অফিস ও কলকাতার প্রধান শাখা সমৃদ্ধিভবনের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ হয় গত ২৩ জুন। সমস্ত শূন্যপদ পূরণ, ঠিকাপ্রথা বাতিল, পার্ট-টাইম কর্মচারীদের ফুলটাইম করানো, ক্যান্টিন বয়দের ব্যাঙ্কে নিয়োগ, সাব-স্টাফদের প্রমোশন, ৮ম দ্বিপাক্ষিক বেতনচুক্তির সম্মানজনক মীমাংসার দাবিতে এবং ব্যাঙ্কের শাখা বন্ধ, মার্জার, কোর ব্যাঙ্কিং চালু করে কর্মী সংকোচন, আউটসোর্সিং-এর বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ বঙ্কিমচন্দ্র বেরা, কেশবচন্দ্র দাস, নূপুর সোম প্রমুখ। কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণকারী সংগঠন এন সি বি এ, এ আই বি ই এ, বি ই এফ আই প্রভৃতির সমালোচনা করে বক্তারা বলেন, কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এই আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। স্টেট ব্যাঙ্ক ছাড়াও অন্যান্য ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা এই বিক্ষোভ সমাবেশে যোগ দেন।

সিপিএম সমর্থিত জোট সরকারের অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি

ন্যূনতমও নয়, কোনও কর্মসূচিও নেই

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ জোট গত ২৭ মে তাদের ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচি প্রকাশ করেছে। জোটের প্রতিটি শরিক এতে স্বাক্ষর দিয়েছে, সিপিএমের নেতৃত্বে কেন্দ্রের সমর্থক বামপন্থীরা একে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে আগামী দিনে তাদের কাজকর্ম এই ন্যূনতম কর্মসূচির ভিত্তিতেই পরিচালিত হবে।

কর্মসূচিতে গরিব, মধ্যবিত্ত থেকে শিল্পপতি পর্যন্ত সমাজের সর্বস্তরের মানুষ, বেকার, ছাঁটাই শ্রমিক, চাষী, নারী-শিশু-বৃদ্ধ সকলের জীবনের সমস্যার সুরাহা; সেচ-সড়ক-বিদ্যুৎ-সেতু-পানীয় জল প্রভৃতি সমস্ত সমস্যার সমাধান; শিক্ষা-স্বাস্থ্য পরিকাঠামো-নির্মাণ কার্যে সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধির গালভরা সমস্ত প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

কিন্তু বাস্তবে যাঁরা এর প্রণেতা, মিথ্যাচার, ভূয়ো প্রতিশ্রুতিদান ও লোকঠকানোয় তাঁদের পটুত্ব অতীতে বহুবার প্রমাণিত। এদিকে আবার কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের প্রতি সিপিএম নেতৃত্বে পরিচালিত বামদলগুলির সমর্থন যে নিছক সুবিধাবাদ নয়; এই সরকার যে গরিবের জন্য, সমাজের নিচের তলার মানুষের জন্য কিছু করতে শপথবদ্ধ এবং সেজন্যই তারা কংগ্রেসকে সমর্থন করছে এই কথাটা বোঝাবার জন্য সিপিএম নেতারা ন্যূনতম কর্মসূচির প্রশংসায় উঠে পড়ে লেগেছেন।

সিপিএম নেতারা জানেন এ প্রশ্ন উঠবেই যে, বহু বছর শাসনক্ষমতায় বসে থেকে দেশের একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থে জনগণকে শুষে নিয়েছে যে কংগ্রেস, যে কংগ্রেস শাসনে এ দেশে বারবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছে, যে কংগ্রেসের হাত অসংখ্য বামপন্থী আন্দোলনের শহীদদের রক্তে রঞ্জিত, সেই ঘৃণিত কংগ্রেসকে সিপিএম সমর্থন করছে কেন? সাম্প্রদায়িক বিজেপিকে ঠেকাতে কংগ্রেসকে সমর্থন করার যে অজুহাত তাঁরা দিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মন থেকে তা কখনোই মেনে নিতে পারে না — এটাও সিপিএম জানে। সিপিএম এও জানে যে, অর্থনৈতিক নীতি, সাম্প্রদায়িকতা, দুর্নীতি — প্রতিটি প্রশ্নে কংগ্রেস ও বিজেপির পার্থক্য কেবল উগ্রতার তারতম্যে ও চালাকির রকমফেরে, নাহলে মৌলিক পার্থক্য কিছুই নেই। এই সরকারে কেন তারা যোগ দিলনা, তার উত্তরে সিপিএম নিজেও বলেছে যে, কংগ্রেস কি তার শ্রেণীচরিত্র পাল্টেছে? অর্থাৎ, কংগ্রেস যে একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণীর দল এবং তার শ্রেণীচরিত্র সে পাল্টায়নি, এটাও সিপিএম মনে করে। তা হলে বিজেপির বিকল্প হিসাবে কংগ্রেসকে সিপিএম তুলে ধরছে কেন? সরাসরি এ-প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে সাম্প্রদায়িক বিজেপি-কে রুখবার যে অজুহাতই তারা দিক, দেশের মানুষের একথা বুঝতে আজ আর কোন অসুবিধা নেই যে নিছক গদির স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই এর পিছনে নেই। যেসব রাজ্যে সিপিএমের সংগঠন দুর্বল বা কিছুই নেই সেখানে কংগ্রেসকে ধরে কিছু সিটে জেতা এবং নানা কারণে দিল্লি সরকারের দরবার-এ-খাস্-এ না গেলেও অন্তত কাছাকাছি থেকে সমস্ত সুবিধা নেওয়া এবং রাজ্যের সরকারি ক্ষমতাকে নিরুপদ্রবে রাখা — কংগ্রেসকে সমর্থনের পেছনে সিপিএমের এই যে সংকীর্ণ লক্ষ্য, একে চাপা দেওয়ার একটা কার্যকরী ঢাল হল এই ন্যূনতম কর্মসূচি।

এজন্যই সিপিএম নেতারা ন্যূনতম কর্মসূচির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এই কর্মসূচির 'কিছু ইতিবাচক দিক আছে' — এমন মামুলি সমর্থন নয়; ন্যূনতম কর্মসূচি সমর্থনে সিপিএমের আগ্রহ কতখানি তা বেরিয়ে এসেছে তাদের নিজেদের বক্তব্য থেকেই। সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক হরকিষেণ সিং সুরজিৎ তাঁদের দলীয় মুখপত্রে লিখেছেন — ''ঐ কর্মসূচিতে এমন অনেক বিষয় আছে যা সাধারণ মানুষের স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত। এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। ঠিক সে কারণেই বামপন্থী দলগুলি সরকারের ঐ অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচিকে স্বাগত জানিয়েছে। মনমোহন সিং সরকার আন্তরিকভাবেই ঐ কর্মসূচি রূপায়ণের যে চেষ্টা চালাবে তা নিয়েও আমাদের কোন সংশয় নেই।'' একদিকে তাঁরা বলছেন, কংগ্রেস তার শ্রেণীচরিত্র পাল্টায়নি, অন্যদিকে বলছেন, এ সরকার সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করবে। এটা তাদের দ্বিচারিতা এবং লোকঠকানো রাজনীতি নয় ? শুধু তাই নয়, ঐ প্রবন্ধেই তিনি আরও বলেছেন, ''স্বার্থান্বেষী মহল অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি রূপায়ণের উদ্যোগকে বানচালের চেষ্টা ইতিমধ্যেই শুরু করেছেন'' (গণশক্তি ১৮-৬-০৪)। অর্থাৎ তাঁদের মতে এই কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের স্বার্থ এতটাই আছে যে স্বার্থান্বেষী মহল তাকে বানচাল করতে সচেষ্ট। এইসব কথার দ্বারা তাঁরা তাঁদের দ্বিচারিতা ও লোকঠকানো রাজনীতিকে আড়াল করে কংগ্রেস-সমর্থনকে যৌক্তিকতার মোড়ক দিয়ে গ্রহণযোগ্য করতে চাইছেন।

বাস্তবে কিন্তু এই ন্যূনতম কর্মসূচি ন্যূনতমও নয়, এতে কোন কর্মসূচিও নেই। ন্যূনতম নয় এজন্য যে, এর আশ্বাস বিশাল। বেকার, মজুর, চাষী, শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা, তফসিলভুক্ত জাতি, আদিবাসী, গরিব এক কথায় সমাজের সর্বস্তরের উন্নয়নের ঢালাও প্রতিশ্রুতির ফাঁকা বুলি ছড়িয়ে আছে এর পুরো দলিলে। তাতে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, শিল্পোন্নয়ন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য জনকল্যাণখাতে সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধি সব কিছুরই ওয়াদা করা হয়েছে। এককথায়, যা যা হলে ভালো হতো তার সবকিছুই এখানে মজুত আছে। নেই কেবল তিনটি জিনিস। প্রথমত এসব প্রতিশ্রুতি রূপায়ণের কোন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি এতে বলা নেই। অর্থাৎ কীভাবে এগুলির রূপায়ণ হবে সে সম্পর্কে কোন কথা নেই।

দ্বিতীয়ত, কবের মধ্যে এসব রূপায়িত হবে, একবারে হবে, না ধাপে ধাপে হবে, তার কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই।

তৃতীয়ত, এসব রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা আসবে কোথা থেকে তার কোন রূপরেখা নেই। ২৪ পাতার দলিলে নামমাত্র কয়েকটি প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে কিছুটা ধোঁয়াটে চেহারা আছে।

প্রথমত, বলা হয়েছে, গ্রাম ও শহরের সমস্ত গরিব ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন সদস্যের বছরে ১০০ দিন কাজ পাওয়া গ্যারান্টি করে একটা আইন করা হবে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ (চলতি বছরে ১০,৭৩৯ কোটি টাকা) ধাপে ধাপে বাড়িয়ে মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৬ শতাংশ (অর্থাৎ প্রায় ৮৫৬০২ কোটি টাকা) করা হবে।

তৃতীয়ত, আগামী পাঁচ বছরে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বরাদ্দ মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ২ থেকে ৩ শতাংশ (অর্থাৎ ২৮ থেকে ৪২ হাজার কোটি টাকা) করা হবে।

চতুর্থত, গরিব ও পশ্চাদপদ ব্লক এলাকায় গণবণ্টন ব্যবস্থার (প্রধানত রেশন) মাধ্যমে পরবর্তী তিন মাসে খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করা হবে। এই সঙ্গে অবশ্যই বলে রাখা হয়েছে যে, এসব করা হবে ''যদি সম্ভব হয়'' (if found feasible)। খাদ্য, পুষ্টি, সড়ক, বন্দর, বিদ্যুৎ, রেল, জল সরবরাহ, সেচ, সকল ক্ষেত্রে সরকারি খরচ বাড়ানো হবে, যতটা দরকার ভরতুকি দেওয়া হবে। পাঁচ বছরের মধ্যে সব ঘরে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে।

কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, এসব ক্ষেত্রে টাকা কোত্থেকে আসবে তা বলা নেই, আর টাকা না থাকলে এসব প্রতিশ্রুতিরও কোন মানে নেই। লিখিত কর্মসূচিতে বা সরকারি দলের নেতা ও মন্ত্রীদের বক্তব্যে — কোথাও অর্থ সঙ্কুলানের রূপরেখা নেই। একটা হিসাবে দেখা যাচ্ছে বছরে ১০০ দিন কাজের গ্যারান্টি দিতে গেলে দরকার বছরে ৮,১২৬ কোটি টাকা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে প্রতিশ্রুত (৬ ও ৩ শতাংশ) বরাদ্দ দিতে বছরে ২৫,০০০ কোটি টাকা চাই (দ্র: আউটলুক ৫-৭-০৪)। এই হিসাব অবশ্য সর্বসম্মত নয়। গণশক্তি (২৬-৬-০৪) পত্রিকায় জয়তী ঘোষের দেওয়া হিসাবে ৪ কোটি ৯০ লক্ষ থেকে ৫ কোটি ৯০ লক্ষ পরিবার আসবে কাজের গ্যারান্টির আওতায় (অর্থাৎ তাঁর মতে জনসংখ্যার মাত্র ৫ থেকে ৬ শতাংশ গরিব)। এজন্য তাঁর হিসাবে, গ্রামীণ কর্মসংস্থান প্রকল্পে বর্তমান বরাদ্দ, ৬,১০০ কোটি টাকার ওপর আরও ৪০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে হবে। টাকার সংস্থান কোথা থেকে হতে পারে ? তার ইঙ্গিতও রয়েছে জয়তী ঘোষের লেখায়। তিনি বলেছেন, প্রতিরক্ষা খাতে খরচ হয় ৬৬,০০০ কোটি টাকা। এই খরচ কমানো যেতে পারে। তাছাড়া তিনি আরও দেখিয়েছেন, ৮০-৮১ সাল থেকে কেন্দ্র যে কর ছাড় দিয়েছে তার পরিমাণ মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৩ শতাংশ, অর্থাৎ কমপক্ষে ৪০,০০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ এখান থেকেও প্রয়োজনীয় টাকা সংগৃহীত হতে পারে। এ তো হল সম্ভাবনার কথা, কিন্তু তা করা হবে কি?

বামপন্থীদের সকলেরই এককালে দাবি ছিল, কেন্দ্রের প্রতিরক্ষা ও রাজ্যের পুলিশ বাজেট কমাতে হবে এবং সেই টাকা জনস্বার্থে ব্যয় করতে হবে। তাছাড়া অপচয়, বিলাসব্যসন, মাথাভারী প্রশাসনিক খরচ কমিয়ে, বৃহৎ ব্যবসায়ীদের উপর কর বসিয়ে অর্থসংস্থান করা যায়। এদেশে এখনও কৃষিজ আয় আয়কর বহির্ভূত, অথচ স্বাধীনতার পর ৫৭ বছরে গ্রামে তৈরি হয়েছে বৃহৎ কৃষি পুঁজিপতিশ্রেণী, যাদের আয় বিশাল। এরা এক পয়সাও আয়কর দেয় না। উল্টে সরকারি কৃষি ভরতুকির একটা বড় অংশ এরা পকেটস্থ করে। কৃষিজ আয়ের ওপর আয়কর বসালে সরকারের বিশাল আয় হতে পারে। কিন্তু এখন শাসক বামপন্থীরা বুর্জোয়া সরকার ও প্রশাসনের অংশ হয়ে গিয়েছে। গ্রামীণ বুর্জোয়াদের সমর্থনেই তারা গ্রামীণ মানুষের ওপর তাদের প্রভাব ধরে রেখেছে। তাই সিপিএম, সিপিআই এখন এসব দাবি তোলে না। বরং এদের সমর্থনে '৯৬ সালে দেবেগৌড়ার সরকার, যারও অর্থমন্ত্রী ছিলেন এই চিদাম্বরমই, প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধি, ভরতুকি হ্রাস ও মালিকশ্রেণীকে ঢালাও কর ছাড় দিয়েছিল এবং তার নাম দিয়েছিল ''স্বপ্নের বাজেট'', যা ছিল জনগণের পক্ষে দুঃস্বপ্নের। কেন্দ্রের কাছে এসব দাবি না তোলার আর একটা কারণ হল, রাজ্য সরকারে বসে অর্থাভাবের দোহাই দিতে দিতে সিপিএম নিজেই আমলা-পুলিশের খরচ বিপুল হারে বাড়াচ্ছে। দুর্নীতি-অপচয়-বিলাসব্যসনও তারা অকাতরেই বাড়াচ্ছে। কাজেই কেন্দ্রের কাছে এসব দাবি তুললেই প্রশ্ন উঠবে, 'আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও।' সিপিএম মুশকিলে পড়ে যাবে। তাছাড়াও শাসকসুলভ দায়িত্ববোধ ও বুর্জোয়া দমননীতির দ্বারা চালিত হওয়ায় সিপিএম লাঠি-গুলি চালিয়ে গণআন্দোলন দমনের জন্য সামরিক ও পুলিশখাতে ব্যয়বৃদ্ধিকে বাস্তব এবং অপরিহার্য মনে করে। তাই তারাও পুলিশ খাতে ক্রমাগত ব্যয়বৃদ্ধি করছে এবং মালিকশ্রেণীকে সরকারের প্রাপ্য টাকা ও কর ছাড় দিচ্ছে। সেই কারণেই, কেন্দ্রের ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য ব্যয় সংকোচনের দাবি তারা কার্যকরীভাবে তুলছে না।

ন্যূনতম কর্মসূচির এই ঢালাও প্রতিশ্রুতির কণামাত্রও যে রূপায়িত হবে না, সিপিএম নেতারা তা ভালোই জানেন। জনগণ তখন তাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। তাই, তেমন সময় নিজেদের পিঠ বাঁচাতে তাঁরা এও বলে রাখছেন, ন্যূনতম সাধারণ ''কর্মসূচিতে বিভিন্ন ইতিবাচক বিষয়ের উল্লেখ থাকলেও স্পষ্ট করে বলা নেই যে, ঐ প্রতিশ্রুতিগুলি কবে বা কীভাবে রূপায়িত হবে'' (সুরজিৎ, গণশক্তি ১৮-৬-০৪) এসব তাঁরা এখন বলে রাখছেন, কারণ ভবিষ্যতে যখন দেখা যাবে, ন্যূনতম কর্মসূচির প্রতিশ্রুতি পালিত হচ্ছে না, বরং কর-দরবৃদ্ধি, ছাঁটাই, ধনীদের কর ছাড়, গরিবের উপবাস সবই চলছে — তখন সিপিএমের নেতারা বলবেন — কংগ্রেস বুর্জোয়াদের দল, ওরা যে প্রতিশ্রুতি রাখবে না, তা তো আমরা আগেই বলেছিলাম। এই বলে সুবিধামতো সাফাই গাইবার পথ সাফ রাখবার জন্যই তাঁরা এই কর্মসূচি রূপায়ণ করার তদারকির উদ্দেশ্যে গঠিত নজরদারি কমিটিতেও যোগ দেননি। অথচ তাঁরা বলছেন, কায়েমী স্বার্থবাদীরা কর্মসূচি বানচাল করতে চেষ্টা চালাচ্ছে, বামপন্থীদের এজন্য সতর্ক থাকতে হবে। এর থেকে বড় দ্বিচারিতা আর কী হতে পারে !

অর্থাৎ গদির স্বার্থে কংগ্রেসকে সমর্থন করা, আবার সময় মতো গা বাঁচানো — এই দুমুখো প্রতারণার রাজনীতি অনুসরণ করতে গিয়ে তাঁরা পদে পদে স্ববিরোধিতায় জড়িয়ে পড়ছেন, যা তাঁদের সুবিধাবাদী রাজনীতির স্বরূপ দেখিয়ে দিচ্ছে। একে তো এই ঢালাও প্রতিশ্রুতি রূপায়ণের টাকা কোথা থেকে আসবে সেই অত্যন্ত সঙ্গত প্রশ্নটা তাঁরা তুলছেন না। তার ওপর তাঁরা যখন বলছেন, এই কর্মসূচি কবে কীভাবে রূপায়িত হবে তারই হদিস নেই, তখন এ প্রশ্ন না উঠে পারে না যে — এমন ভূয়ো প্রতিশ্রুতিকে তাঁরা জেনে- বুঝে সমর্থন করছেন কেন? কংগ্রেস বুর্জোয়া দল বলার পরেও ন্যূনতম কর্মসূচিও যে বুর্জোয়াদের স্বার্থেই কংগ্রেস রচনা করেছে — একথা স্পষ্ট ভাষায় বলতে তাঁদের আটকাচ্ছে কেন? কেন এই কর্মসূচির মালিকঘেঁষা চরিত্র তাঁরা তুলে ধরছেন না? কেন তাঁরা এই কর্মসূচি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে মোহ সৃষ্টি করে কংগ্রেসের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার চেষ্টা করছেন?

কারণ নিছক গদির স্বার্থ দেখার প্রক্রিয়ায় সিপিএম এখন ভারতীয় বুর্জোয়াদের দ্বিদলীয় পরিষদীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত জনবিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রত্যক্ষ অংশীদারে পরিণত হয়েছে। গণদাবীতে আমরা আগেই (৫৭ বর্ষ ৪২ সংখ্যা ১১ জুন ০৪) দেখিয়েছি, বুর্জোয়াশ্রেণীরই স্বার্থবাহী দু'টি জনবিরোধী বুর্জোয়া দলের

ছয়ের পাতার দেখুন

গ্রামাঞ্চলে অনাহারজনিত নিদারুণ অপুষ্টি

নীরব ঘাতকের ভূমিকা পালন করে চলেছে

গত ২৭ বছরের সিপিএম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের কাজ হল একটাই। তা হ'ল একচেটিয়া শিল্পপতিদের সেবা করার পাশাপাশি তাঁদের রাজত্বে রাজ্যবাসীর কত উন্নয়ন হয়েছে তার সম্ভব-অসম্ভব দাবি তারস্বরে প্রচার করা। এই দাবি অনুযায়ী ভূমি সংস্কারের কাজ ওদের রাজত্বে নাকি এত সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে যে রাজ্যে কৃষি উৎপাদনের হার বেড়েছে ব্যাপক, গ্রামে দারিদ্র্য কমেছে, ভূমিহীন খেতমজুররা জমি পেয়েছেন, ফসলের অভাবী বিক্রি এখন অতীতের বিষয়, মানুষ খাচ্ছে আগের তুলনায় অনেক বেশি, অভাবের তাড়নায় গ্রাম ছেড়ে শহরে আসার প্রবণতা বন্ধ হয়েছে, খেতমজুরেরা মজুরি পাচ্ছে যথেষ্ট ইত্যাদি ইত্যাদি (পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্রর নিবন্ধ দ্রষ্টব্য, মার্কসবাদী পথ, মে' ৯৭)। সিপিএম নেতা-মন্ত্রীদের এই দাবি যে কত অসার তা আমরা তথ্য প্রমাণ সহযোগে — বার বার গণদাবীর বিভিন্ন সংখ্যায় দেখিয়েছি। কিন্তু সিপিএম নেতারা জেনেশুনে নিজেদের চূড়ান্ত জনবিরোধী চরিত্রকে আড়াল করতে নিকৃষ্ট বুর্জোয়া রাজনীতি করে চলেছেন। নিজেদের ঢাক ওঁরা নিজেরাই পেটাচ্ছেন এবং এই কাজ করতে গিয়ে তথ্যের বিকৃতি, বাস্তবকে অস্বীকার এবং মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির মহৎ কর্মই ওঁরা এতদিন ধরে চালিয়েছেন। কিন্তু বাস্তব বড় নিষ্করুণ। সিপিএম নেতা-মন্ত্রীদের মন জুগিয়ে চলার কোন দায় তার নেই। তাই ওঁরা যত চেষ্টাই করুন না কেন সত্যকে আর চেপে রাখতে পারছেন না। এটা ক্রমশই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, এ রাজ্যে 'দারিদ্র্য অসহ', এ রাজ্যে কর্মহীন উপায়হীন শ্রমিকের গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই; এ রাজ্যে গ্রামাঞ্চলে অনাহারজনিত নিদারুণ অপুষ্টি এক নীরব ঘাতকের ভূমিকা পালন করে চলেছে। রাজ্যের এই হ'ল যথার্থ পরিস্থিতি।

মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র দায়বদ্ধতা থাকলে সিপিএমের নেতা-মন্ত্রীরা নিজেদের মালিকতোষণকারী ভ্রান্ত নীতি পরিত্যাগ করে সমস্যা সমাধানে বাস্তবসম্মত উদ্যোগ গ্রহণ করতেন। কিন্তু মানবোচিত এই উদ্যোগ গ্রহণ তো দূরের কথা তাঁরা বলছেন — ''অনাহারে আমলাশোলে কারও মৃত্যু হয়নি। যে পাঁচজনের মৃত্যুর খবর জানা গেছে তাদের মৃত্যু হয়েছে বিভিন্ন রোগে। ঠিকমত চিকিৎসা না হবার বিষয়টি রয়েছে। এর পিছনের অন্যতম কারণ দারিদ্র্য। কিন্তু অনাহারে কারও মৃত্যু হয়নি।'' (সিপিএম রাজ্য সম্পাদক শ্রীঅনিল বিশ্বাসের বক্তব্য, গণশক্তি ১৫-৬-০৪)। কী চমৎকার কথা! অনাহারে মৃত্যু হয়নি, হয়েছে অপুষ্টি ও দারিদ্র্যের জন্য! অপুষ্টি কি অধিক খেয়ে? নাকি না খেয়ে? শ্রী বিশ্বাস অবশ্য এই প্রশ্নের উত্তর দেননি। এক্ষেত্রে সিপিএম নেতাদের সাথে আজ বিজেপি-কংগ্রেস নেতাদের কী অদ্ভুত সাদৃশ্য!

এতসবের পরেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য অকুতোভয়। ডোন্টকেয়ার ঢংয়ে তিনি আরও বলেছেন — ''আমন ধান প্রতি কুইন্টাল কৃষকেরা সাড়ে চারশো থেকে পাঁচশো টাকা দাম পেয়েছেন। আমরা কিনেছি ৫৩০ টাকা কুইন্টাল। গ্রামে সেচের সুযোগ বেড়েছে। খাদ্যে, ভূমি সংস্কারে, গ্রামীণ অর্থনীতিতে আমরা সাফল্যের জায়গায় গেছি।'' (গণশক্তি ১৫-৬-০৪) এবং এসবের ফলেই নাকি ''দেশের অন্য যেকোন রাজ্যের চেয়ে এ রাজ্যে দারিদ্র্যসীমার নিচে রয়েছেন এমন মানুষ কম। গ্রামে আরও কম'' (ঐ)। মুখ্যমন্ত্রীর মতে এর পরিমাণ নাকি মাত্র ''১৫ থেকে ২০ শতাংশ মানুষ'' (ঐ)। রাজ্যে অর্ধাহার-অনাহারক্লিষ্ট সাধারণ মানুষের সংখ্যা কমে গিয়েছে এটা প্রমাণ করতে মুখ্যমন্ত্রী যে বৃহৎ তালিকা পেশ করেছেন এবার সে প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা যাক।

গ্রাম বাংলার কৃষি কাজের হালহকিকৎ সম্পর্কে যারা বিন্দুমাত্র খোঁজখবর রাখেন তাঁরাই জানেন, এ রাজ্যে চাষের খরচ ক্রমাগতই বাড়ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী ১৯৯১ থেকে ১৯৯৭ সাল এই কালপর্বে সেচের খরচ বেড়েছে ১৭৪.৭৭ শতাংশ, কীটনাশকের দাম বেড়েছে ৭৮.০১ শতাংশ, রাসায়নিক সার বাবদ খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৮.৩৬ শতাংশ, ট্রাক্টর ও অন্যান্য মেশিন ভাড়ার খরচ বেড়েছে ১৬১.৩২ শতাংশ। তারপর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই সমস্ত জিনিসের মূল্য যে আরও অনেক বেড়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিদ্যুতের অবস্থা তো আরও ভয়াবহ। রাজ্যে মোট ৯৬ হাজার মোটর চালিত পাম্পসেট আছে। ১৯৯৪ সালে যেখানে এইসব পাম্পসেটের এক একটার উপর বাৎসরিক চার্জ ছিল ৬০০ টাকা, বর্তমানে তা ৭ হাজার টাকার উপরে — অর্থাৎ বৃদ্ধি ১১ গুণেরও বেশি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় চাষের খরচ বেড়েছে বহুগুণ এবং তা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মিলিত কুকর্মেরই ফল। লক্ষণীয় হল সাফল্যের কথা বলতে গিয়ে অসুবিধাজনক এই বিষয়টি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভুলেও উল্লেখ করেননি।

কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুক ঠুকে কৃষকের ধানের লাভজনক দাম পাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, গ্রাম বাংলার চাষীরা নাকি কুইন্টাল প্রতি আমন ধানে ''সাড়ে চারশো থেকে পাঁচশো টাকা'' দাম পেয়েছে। জানতে ইচ্ছা করে যে বাজারে চাষীরা এই দাম পেয়েছে তার ঠিকানা কী। জানতে পারলে আগামী দিনে যে আমন ধান উঠবে বাংলার সমস্ত চাষীদের সেই বাজারে ধান বিক্রির পরামর্শ দেওয়া যেত। সে যাই হোক, বাস্তব কথা হল — গত বছর আমন ধান ওঠার পর চাষীরা মিল মালিক ও ব্যবসায়ীদের নিযুক্ত ফড়েদের হাতে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে প্রতি কুইন্ট্যাল ২৭৫ থেকে ৩২৫ টাকা দরে। কুইন্টালে ৫০০ টাকা প্রাপ্তি তাঁদের কাছে এখনও স্বপ্ন। বাস্তব এই অবস্থা গায়ের জোরে অস্বীকার করা যাবে না।

ধানের দাম নিয়ে তিনি এখানেই থেমে থাকেননি। বলেছেন — ''আমরা কিনেছি ৫৩০ টাকা কুইন্টাল।'' রাজ্য সরকার ৫৩০ টাকা কুইন্টাল দরে আমন ধান সংগ্রহ করেছিল, এ আমরা জানি। কিন্তু এই ধান কেনা হয়েছিল কাদের কাছ থেকে? চাষীদের কাছ থেকে নয়, কিনেছিল মিল মালিকদের কাছ থেকে।

বিষয়টা পরিষ্কার করে বলা যাক্। রাজ্য সরকার ধানের সহায়ক মূল্য প্রথম ঘোষণা করে ২০০১ সালের ২৩ নভেম্বর। তখন এক সার্কুলারে বলা হয় মিলমালিকেরা সরকারি দামে চাষীদের কাছ থেকে ধান কিনবে এবং সরকার মিল মালিকদের কাছ থেকে মোটা চাল ৮৭১.৯০ টাকা এবং সরু চাল ৯১৩.৬০ টাকা কুইন্টাল দরে কিনবে। তখন ঠিক হয়েছিল এই প্রক্রিয়ায় সারা রাজ্যে ৬ লক্ষ টন চাল সংগ্রহ করা হবে। এই সিদ্ধান্ত কী প্রমাণ করে? প্রমাণ করে চাষীদের কাছ থেকে সরকার সরাসরি কোন ধান কিনবে না। সরকারি দামে চাষীদের কাছ থেকে ধান কিনবে মিল মালিকেরা। মিল মালিকেরা এই দায়িত্ব তাদের চরিত্রানুযায়ী পালন করেছে। তারা দালালদের সহায়তায়, সরকারি দল ও নেতাদের সঙ্গে যোগসাজসে, পঞ্চায়েত কর্তাদের হাত করে সরকারি দরে ধান কেনার সার্টিফিকেট জোগাড় করেছে এবং কৃষকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে কোটি কোটি সরকারি টাকা আত্মসাৎ করেছে। মিল মালিকদের এই চরিত্রের কথা কি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অজানা?

আমাদের এই বক্তব্য যে মনগড়া বা অমূলক নয় তার প্রমাণ মিলবে ক্যাগের রিপোর্টে। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে — ''বর্ধমান জেলার ডি এল এস সি (চাল ক্রয়ের সর্ববৃহৎ জেলা) জুন ২০০২এ অনুধাবন করেছে চাষীদের এম এস পি (ন্যূনতম সহায়ক মূল্য) প্রদানের ব্যাপারে কল মালিকদের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও চাল ক্রয়ে চাষীদের ধানের এম এস পি দেওয়া হয়নি।'' (ক্যাগ রিপোর্ট, ২০০২, সিভিল, পৃঃ ১৩৪) তাহলে কি পাওয়া গেল? কুইন্টাল প্রতি ধান কেনার যে গল্প মুখ্যমন্ত্রী পরিবেশন করেছেন — সেই সহায়তা গ্রাম বাংলার কৃষক সমাজ পায়নি, পেয়েছে রাজ্য সরকারের প্রকৃত বন্ধু, চালকল মালিকেরা। আর এইভাবে রাজ্য সরকারের একদিকে গ্রামীণ জোতদার মহাজন মিল মালিকদের সহায়তা ও অন্যদিকে কৃষক বিরোধী নীতির ফলে গ্রাম বাংলার চাষীরা সর্বস্বহারা হয়ে পড়ছেন। তথ্য বলছে, গত ৫ বছরে রাজ্যে কৃষকের সংখ্যা কমে গিয়েছে ৮ লক্ষ এবং তাদের হাত থেকে জমি চলে গিয়েছে ৪৭ লক্ষ ৬৩ হাজার বিঘা। (Evaluation wing, Directorate of Agriculture, Govt. of WB) এই হল গণশক্তিতে প্রকাশিত মুখ্যমন্ত্রী কথিত 'গ্রামীণ অর্থনীতিতে সাফল্যে'র যৎকিঞ্চিত নমুনা।

সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের আমলে কৃষকের সংখ্যা কমে গেলে কী হবে, ভূমিহীন খেতমজুরের সংখ্যা কিন্তু বাড়ছে হু হু করে। ১৯৯১ সালে কৃষি কর্মীদের মধ্যে ভূমিহীন কৃষিমজুরদের সংখ্যা ছিল ৪৬.৪ শতাংশ। পরের দশ বছরে এটা প্রায় নাটকীয়ভাবে বেড়ে ২০০১ সালে হয় ৫৬.৭ শতাংশ। সংখ্যার দিক থেকে ১৯৭১, ১৯৮১, ১৯৯১ সালে ভূমিহীন কৃষিমজুরের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩২.৭২; ৩৮.৯২ ও ৫০.৫৫ লক্ষ। ২০০১ সালে এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৩.৫১ লক্ষ। (Census Report of 1971, '81, '91 ও 2001) প্রতি কৃষিমজুর পিছু যদি ২ জন পোষ্য ধরা যায় তবে কৃষিমজুরির উপর নির্ভরশীল রাজ্যের ২ কোটি ২১ লক্ষ মানুষের (রাজ্যের সমগ্র জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ) অবস্থা কী? রাজ্যের খেতমজুরেরা বছরে গড়পড়তা ১১৪ দিন কাজ পান, যদিও সকলে কাজ পাননা।

ছয়ের পাতায় দেখুন

বক্তব্য রাখছেন কমরেড পঞ্চানন প্রধান

মেদিনীপুরে প্রতিবাদ সভা

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলপাহাড়ীর আমলাশোলে অনাহারে মৃত্যুর প্রতিবাদে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শাসক অফিসে এস ইউ সি আই-এর শান্তিপূর্ণ আইন অমান্য আন্দোলনে ও মেদিনীপুর শহর বন্‌ধে পুলিশ-প্রশাসন ও সিপিএম-এর যুক্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় ২৭ জুন মেদিনীপুর শহরের রবীন্দ্র নিলয় হলে। সভায় সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই দলের মেদিনীপুর শহর কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রাণতোষ মাইতি। এই সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও কাউন্সিলর ভানুরতন গুঁইন, এ পি ডি আর-এর পক্ষে অধ্যাপক সুরেশ চন্দ্র দাস, বিশিষ্ট আইনজীবী অশ্বিনী সেন, অধ্যাপক জগবন্ধু অধিকারী, সমাজসেবী শ্যামল দাস, স্বাস্থ্য আন্দোলনের বিশিষ্ট সদস্য ভবানী মণ্ডল, এস ইউ সি আই দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড পঞ্চানন প্রধান, জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অমল মাইতি। অধ্যাপক সুরেশচন্দ্র দাস বলেন — পশ্চিমবঙ্গে বামরাজত্বে মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছে আর নেতারা তা অস্বীকার করে বিবৃতি দিচ্ছেন এবং ঠাণ্ডা ঘরে বিরিয়ানি যোগে অনাহার-মৃত্যুর সমাধান নিয়ে আলোচনা করছেন। অশ্বিনী সেন তীব্র ভাষায় পুলিশ ও সিপিএম বাহিনীর যৌথ আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে বলেন, এস ইউ সি আই দলের কর্মীদের পিটিয়ে গ্রেপ্তার করে, থানা লক-আপে অসুস্থ রক্তাক্ত কর্মীদের চিকিৎসা না করে, যেভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে রেখেছে এবং মিথ্যা মামলা দিয়েছে তার বিরুদ্ধে মানবাধিকার কমিশনে যাওয়া উচিত। কমরেড পঞ্চানন প্রধান বলেন, এস ইউ সি আই কর্মীদের উপর এত বেপরোয়া পুলিশি আক্রমণের কারণ — গরিব-মেহনতী মানুষের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের দাবিতে আন্দোলন করছে একমাত্র এস ইউ সি আই। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নাগরিকদের পক্ষ থেকে ডি এম এবং এস পি'র নিকট ডেপুটেশন ও মানবাধিকার কমিশনে যাওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ইরাকের জনগণ যোগ্য জবাব দিচ্ছে

একের পাতার পর

কিছু দালালদের নিয়ে আমেরিকার দ্বারাই তৈরি। ইরাকিদের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দেওয়া এই দালাল সরকার বা পুতুল সরকার ইরাকের স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণ মেনে নিতে পারে না। এই সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের বিক্ষোভ অবশ্যম্ভাবী — এটা বুঝেই বুশ প্রশাসন ইরাকে ১ লাখ ৬০ হাজার মার্কিন সেনা মোতায়েন রেখেছে। এই সেনাবাহিনীর উপর অন্তর্বর্তী সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না, সেনাবাহিনী সক্রিয় থাকবে বুশ প্রশাসনের নির্দেশে। তাহলে অন্তবর্তী সরকার কোথায় সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী? এই পুতুল সরকারের নিয়ন্ত্রণও আমেরিকার হাতেই। আমেরিকার অধীনেই এই সরকারের স্বাধীনতা। মার্কিন প্রশাসনের হাত থেকে লোকদেখানো ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষিত দিন ছিল ৩০ জুন। দু'দিন আগেই চোরাগোপ্তাভাবে হস্তান্তর পর্বটি সেরে ফেলা হয়। কারণ মার্কিন কর্তাদের কাছে খবর ছিল, পুতুল সরকারের অভিষেককে অভ্যর্থনা জানাতে রীতিমতো তৈরি হচ্ছে স্বাধীনতা যোদ্ধারা।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেই আমেরিকা সেই সরকারের হাতে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হুসেনের বিচারের ভার তুলে দিয়েছে। সাদ্দাম হুসেন ইরাকের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী, একজন বলিষ্ঠ যোদ্ধা। আজকের দুনিয়ায় আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তেজোদীপ্ত লড়াইয়ের মূর্ত প্রতীক তিনি। আজ ইরাক সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গৌরব বহন করে। আর এই লড়াইয়ের অবিসংবাদী নেতা সাদ্দাম হুসেন। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের পর আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের দেশে দেশে হানাদারির বিরুদ্ধে ইরাক একটা বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। আজ সাদ্দামের বিচারের প্রহসনের মুখ্য উদ্দেশ্য — আবার দুনিয়ার সামনে সাদ্দাম হুসেনকে 'দানব' বানানো এবং এটা দেখানো যেন যথার্থই একজন দানবের হাত থেকে ইরাকের জনগণকে মুক্তি দেওয়ার মহৎ দায় পালন করতে মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ইরাকে আগ্রাসন চালিয়েছে। এজন্য সাজানো সাক্ষী, নকল প্রমাণ, ভুয়া তথ্য হাজির করা হবে আদালতে। সাম্রাজ্যবাদী লুটেরাদের এসব চালাকি নতুন নয়, যার পর্দা ফাঁস করে দিয়েছেন সাদ্দাম হুসেন নিজে বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে। একটি দেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে যেভাবে হাতে শিকল পরিয়ে সাজানো বিচারসভায় হাজির করা হল, তা কেবল ইরাকের নয়, বিশ্বের সকল দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণের প্রতি অপমান। এর যোগ্য জবাব ইরাকের জনগণ দিচ্ছে, তাদের পাশে আজ ভারত সহ বিশ্বের সকল দেশের জনগণের সমবেত হওয়া জরুরি কর্তব্য।

দেশে দেশে আন্দোলন ধর্মঘট

নাইজেরিয়ায় দেশজুড়ে ধর্মঘট

পেট্রল, ডিজেল ও গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে গত ১০ জুন নাইজেরিয়ায় সাধারণ ধর্মঘট পালিত হল। দেশব্যাপী এই সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল সে দেশের শ্রমিক সংগঠনগুলি। দেশের লক্ষাধিক শ্রমিক এসব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। দেশব্যাপী এ ধর্মঘটে তেলশ্রমিকরা যোগ দেওয়ায় তেল উত্তোলন ও রপ্তানি বন্ধ ছিল। সাধারণ ধর্মঘটের জেরে সারা দেশে স্কুল-কলেজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-কোর্ট-কাছারি, দোকান-পাট সবই বন্ধ ছিল। এমনকী হেলিকপ্টারের ক্রু'রা ধর্মঘটে যোগ দেওয়ায় হেলিকপ্টার সার্ভিসও বন্ধ ছিল। দেশের সব শহরে যান চলাচল বন্ধ ছিল। রাজধানী আবুজার গ্যাস স্টেশনে পিকেটিং করার সময় পুলিশের গুলিতে দু'জন ধর্মঘটী গুরুতর আহত হন। উল্লেখ্য যে, ২০০৩ সালে জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে দেশব্যাপী ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে পুলিশের গুলিতে ১২ জন ধর্মঘটী শহীদের মৃত্যু বরণ করেছিলেন।

(সূত্র ঃ হিন্দু ১২-৬-০৪)

ফ্রান্সে বিদ্যুৎ ও গ্যাস কর্মীদের ধর্মঘট

ফ্রান্সের রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎ সংস্থা ই ডি এফ-এর আংশিক বিলগ্নীকরণের প্রতিবাদে ১৫ জুন শ্রমিক-কর্মচারীদের ধর্মঘটে দেশের বহু শহর দফায় দফায় সংঘর্ষে শতাধিক শ্রমিক গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন ১৪ জুন সারা দেশে শিল্প ধর্মঘট ডাকা হয়। (সূত্র ঃ ডেকান হেরাল্ড, ১৪-৬-২০০৪)

২৭ জুন ইস্তাম্বুলে ন্যাটো-বিরোধী বিক্ষোভে সামিল সেদেশের মহিলারা

সিওলে ব্যারিকেড ও বিক্ষোভ

১৩ জুন দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওলে রুটিন মাফিক ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের বাৎসরিক সম্মেলন বসেছিল। এই সম্মেলন ঘিরে সেদিন গোটা সিওল শহর উত্তাল হয়েছে। বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন কোরিয়ান কনফেডারেশান অফ ট্রেড ইউনিয়নস সংক্ষেপে কে সি টি ইউ-র ডাকে কয়েক হাজার শ্রমিক ফোরামের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে মিছিল বার করে। মিছিলকারীরা দুনিয়াব্যাপী দারিদ্র্যের জন্য ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের মতো সাম্রাজ্যবাদী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলে। বিভিন্ন দেশ থেকে আসা ডেলিগেটরা যাতে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য সম্মেলন স্থলের সামনে কয়েক হাজার শ্রমিক রাস্তা অবরোধ করে বসে পড়েন। রায়ট পুলিশ এসে গায়ের জোরে সরাতে গেলে তাদের সঙ্গে শ্রমিকদের অন্ধকারে ডুবে গেছে এবং প্রধানমন্ত্রী রাফারিন সহ মন্ত্রীসভার অন্য সদস্যদেরকেও অন্ধকারে কাটাতে হয়েছে। এদিনের ধর্মঘটে গ্যাস শ্রমিকরাও অংশ নিয়েছে। কারণ রাষ্ট্রায়ত্ত গ্যাস শিল্প সংস্থা জি ভি এফকেও আংশিক বিলগ্নীকরণ করা হচ্ছে।

এজন্য রাষ্ট্রপতি জ্যাক শিরাকের সরকার সংসদে একটি বিল আনছে। সরকার জরুরি বিনিয়োগের কারণ দেখিয়ে বিদ্যুৎ ও গ্যাস শিল্পের যথাক্রমে ৩০ ও ৪০ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর বিরোধিতা করে বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন সি জি আই বিদ্যুৎ ও গ্যাস শ্রমিকদের ধর্মঘটের ডাক দেয়। এরপরই সরকার সংসদে ঐ বিল আপাতত পেশ করবে না বলে ঘোষণা করেছে। (সূত্র ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১৬-৬-০৪)

ইরাক থেকে সেনা ফিরিয়ে আনার দাবিতে ২৪ জুন দক্ষিণ কোরিয়ায় বিক্ষোভ

১০০ দিনের কাজ

একের পাতার পর

মধ্যেও শ্রমিক-চাষী-গরিব মানুষের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করা সম্ভব হবে।

তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে, এই জনস্বার্থবাহী সিএমপি (অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি) -কে বানচাল করার জন্য দেশের কায়েমী স্বার্থবাদীরা নানানভাবে চেষ্টা করবে। তাই তাঁরা বলেছিলেন, সিএমপি-কে কার্যকরী করার জন্য যেমন সংসদের মধ্যে লড়াই প্রয়োজন, তেমনি সংসদের বাইরেও সাধারণ মানুষকে নিয়ে আন্দোলনের চাপ সৃষ্টি করা দরকার। আজ যখন সেই কর্মসূচি অনুযায়ী বিপিএল তালিকাভুক্ত গরিব মানুষদের বছরে ১০০ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্পটি রূপায়ণের কথা প্রধানমন্ত্রী বলছেন, তখন সূর্যবাবুদের বক্তব্য হল, ''বাস্তব পরিস্থিতির সাথে এই প্রতিশ্রুতি খাপ খায় না'' (গণশক্তি, ৩০-৬-০৪)। অথচ সিপিএম নেতাদের প্রচার অনুযায়ী বাস্তবে তো এটাই হওয়ার কথা যে, এমন একটি কর্মসূচি, যার দ্বারা রাজ্যের বিপুল সংখ্যক কর্মহীন, গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের বছরে অন্তত ১০০ দিনের কাজের সুযোগ জুটবে — তা একচেটিয়া পুঁজিপতিশ্রেণীর দল কংগ্রেস নেতারা বানচাল করতে চাইছে, আর তা কার্যকরী করার জন্য গরিবের পার্টি (!) সিপিএম লড়াই করে যাচ্ছে।

অথচ বাস্তবে আমরা কী দেখছি? দেখছি, সিএমপি-র অঙ্গ হিসাবে বুর্জোয়া কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রী এটি কার্যকরী করার কথা বলছেন, আর তথাকথিত মার্ক্সবাদী জনদরদী(!) সিপিএম নেতারা তার বিরোধিতা করছেন। সূর্যবাবু তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন, ''ভূমিসংস্কার ছাড়া গ্রাম ভারতের বিকাশ সম্ভব নয়। ভূমিসংস্কারের কর্মসূচিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত'' (ঐ)। ভূমিসংস্কারকে যে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত তা অতীব সত্য। কিন্তু তার সাথে এখনই গ্রামীণ গরিব মানুষকে বছরে ন্যূনতম ১০০ দিনের কাজ দেওয়ার কর্মসূচিকে কার্যকরী করার কী বিরোধ থাকতে পারে ? প্রধানমন্ত্রী যেখানে এই কর্মসংস্থান প্রকল্প রূপায়ণের ব্যাপারে তাঁদের মতামত চেয়েছেন, সেখানে ভূমিসংস্কারের প্রশ্ন তুলে এর বিরোধিতা করা কি ধান ভানতে শিবের গীত নয়? তাঁরা যদি সত্যিই মনে করেন যে, সিএমপি-র অন্তর্ভুক্ত গরিব মানুষদের ১০০ দিন কাজ দেওয়ার এই কর্মসূচি বাস্তব পরিস্থিতির সাথে খাপ খায় না, তবে তাঁরা এই কর্মসূচি প্রণয়নের সময় বিরোধিতা করেননি কেন? কেন তাঁরা বলেননি, এই কর্মসূচিতে তাঁদের দ্বিমত রয়েছে? সেদিন তাঁরা বিরোধিতা করেননি শুধু নয়, এগুলিকে দেখিয়েই শুধু দেশের সাধারণ মানুষ নয়, তাঁদের দলের কর্মী-সমর্থকদেরও বুঝিয়েছিলেন যে, এই সরকার কতখানি জনমুখী এবং তাকে সমর্থন করা কতখানি যুক্তিযুক্ত! তাঁদের এই আচরণ কি দেশের মানুষের সাথে প্রতারণা নয়? মুখে এক, মনে আর এক — এ কি দ্বিচারিতা নয়?

বামফ্রন্টের ২৭ বছরের রাজত্বে পশ্চিমবাংলার মানুষের সার্বিক উন্নয়নের প্রশ্নে তাঁদের একাদিক্রমিক প্রচারের বেলুনটি আজ চুপসে গেছে। শুধু যে উত্তরবঙ্গের চা বাগানের শ্রমিকরাই আজ অনাহারে মারা যাচ্ছে তা নয়, পশ্চিম মেদিনীপুরের আমলাশোলে পাঁচ জন মানুষের অনাহারে মৃত্যু, জেলায় জেলায় এই অনাহার-অর্ধাহারের পরিস্থিতি এবং ফসলের দাম না পেয়ে রাজ্য জুড়ে ঋণগ্রস্ত চাষীদের একের পর এক আত্মহত্যা তাঁদের তিন দশকের উন্নয়নের আসল চিত্রটিকে রাজ্যবাসীর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। আমলাশোলের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে স্তরে স্তরে সিপিএম নেতারা পর্যন্ত কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন — অথচ বাস্তবে যখন এই হতদরিদ্র মানুষগুলির বাঁচার জন্য অন্তত

সাতের পাতায় দেখুন

এ আই ডি এস ও'র দক্ষিণাঞ্চলীয় শিক্ষাশিবির

অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে অনুষ্ঠিত হ'ল সারা ভারত ডিএসও'র দক্ষিণাঞ্চল রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির। এ আই ডি এস ও'র ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত বর্ষব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে গত ১৭ থেকে ২০ জুন তামিলনাড়ুর ইরোড শহরে এই শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ ভারতের চারটি রাজ্য কেরালা, কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু থেকে ২১০ জন প্রতিনিধি এই শিক্ষাশিবিরে অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষাশিবির পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, এ আই ডি এস ও'র সর্বভারতীয় উপদেষ্টা কমরেড প্রভাস ঘোষ এবং এ আই ডি এস ও'র প্রতিষ্ঠাপর্বের সংগঠক ও বর্তমানে এস ইউ সি আই দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। শিক্ষাশিবির আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা করেন এ আই ডি এস ও'র সাধারণ সম্পাদক কমরেড দেবাশীষ রায়। এছাড়াও সর্বভারতীয় কমিটির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন অন্যতম সহ-সভাপতি কমরেড এম শ্রীরাম এবং সম্পাদকমণ্ডলীর দুই সদস্য কমরেড সৌরভ মুখার্জী ও কমরেড সুব্রত গৌড়ী।

১৭ জুন সকালে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ এবং মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের অস্বাভাবিক ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে শুরু হয় শিক্ষাশিবিরের মূল কর্মসূচি। প্রথম অধিবেশনে মূলত বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত প্রতিনিধিরা তাঁদের প্রশ্ন ও সাংগঠনিক সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। পরের অধিবেশনগুলিতে কমরেড প্রভাস ঘোষ এবং কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী মূল আলোচনা করেন। প্রত্যেক অধিবেশনের

আলোচনা করছেন কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। মঞ্চে উপস্থিত কমরেড প্রভাস ঘোষ ও ছাত্রনেতৃবৃন্দ।

শেষে অনুষ্ঠিত হয় গ্রুপ আলোচনা। পারস্পরিক অংশগ্রহণে আলোচনাগুলি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। প্রত্যেকেই চেয়েছেন কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার আলোকে তাদের প্রশ্নের উত্তর বুঝে নিতে। সকাল থেকে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের আলাপ-আলোচনার পরিবেশে ক্যাম্পজীবন ছিল প্রাণবন্ত। আলাপ-আলোচনার ফাঁকে চলেছে গান, নাচ, নাটক প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কর্মসূচি। সবশেষে ১৯৭৪ সালে কটকে অনুষ্ঠিত ডি এস ও'র সর্বভারতীয় সম্মেলনে প্রদত্ত কমরেড শিবদাস ঘোষের ভাষণের অংশবিশেষ টেপ রেকর্ড থেকে শোনানো হয়।

২০ জুন বিকেলটা ছিল বিচ্ছেদের বেদনায় ভারাক্রান্ত। আলাপ-আলোচনা, সঙ্গীত-নাটকের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের যে ছাত্ররা এত কাছে এসে গিয়েছিল, তাদের পরস্পরকে ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাই অনেকের চোখেই ছিল জল। আবার ছিল দৃঢ় প্রত্যয়। যে আন্দোলন সকলে মিলেই গড়ে তুলেছে, সেই আন্দোলনের জয়-পরাজয়ের মধ্যেই পাবে একে অপরের কাছ থেকে প্রেরণা। প্রত্যেকেই অন্যকে বলেছে, আবার দেখা হবে যৌথ কর্মসূচিতে, লড়াই-এর ময়দানে, উন্নত আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্য দিয়েই আমরা পরস্পর আরও ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ হব।

অনাহারজনিত নিদারুণ অপুষ্টি

চারের পাতার পর

রাজ্য সরকারের হিসাবমত তাদের দৈনিক মজুরি ৫৫.৯৭ টাকা (বাস্তবে খেতমজুর পান এর থেকে অনেক কম)। এই হিসাবকে সত্য ধরে নিলে একটা খেতমজুর পরিবারের বছরে আয় ১১৪×৫৫.৯৭ টাকা বা ৬৩৮০.৮৫ টাকা, অর্থাৎ মাসিক ৫৩১.৭০ টাকা। অথচ সরকারি হিসাবে দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠতে গেলে এই পরিবারের বছরে আয় থাকার কথা ৩৫০×১২×৩ টাকা বা ১২,৬০০ টাকা (গ্রামীণ দারিদ্র্যসীমা যখন মাথাপিছু মাসিক ৩৫০ টাকা)। দেখা যাচ্ছে খেতমজুর পরিবারের আয় এর অর্ধেক। তাই কোন সন্দেহের অবকাশ না রেখেই বলা যায় রাজ্যের সমস্ত খেতমজুর পরিবারই বাস্তবে দারিদ্র্যসীমার অনেক নিচে বাস করে। এর সাথে গ্রামীণ মজুর ও শহরাঞ্চলের দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যাকে হিসাবে মধ্যে আনলে দেখা যাবে রাজ্যের অর্ধেকের বেশি মানুষই এই দারিদ্র্যসীমার নিচে — যা মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া হিসাবের থেকে অনেক অনেক বেশি। পরিসংখ্যানের কোনও কারচুপি করেই মুখ্যমন্ত্রী এই নিদারুণ সত্যকে অস্বীকার করতে পারবেন না।

আর সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের ভূমিসংস্কার? তথ্য বলছে — ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবাংলা সরকার ১০.৫৮ লক্ষ একর জমি প্রধানত ভূমিহীন এবং প্রান্তিক চাষীদের মধ্যে বিলি করেছে। এর মধ্যে ৬.২৬ লক্ষ একর জমি বিলি হয়েছে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগেই প্রধানত ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে। এর পরে ২৭ বছরে বিলি হয়েছে বাকি ৪.৩২ লক্ষ একর জমি। প্রাক্তন ভূমিসংস্কার কমিশনার দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন — "গ্রামবাংলার ভূমিসংস্কার এখন উল্টোখাতে বইছে। জমি গরিব চাষীর হাত থেকে চলে যাচ্ছে।" (টাইমস্ অব ইন্ডিয়া, ৮-৪-২০০১) বুদ্ধবাবুদের ভূমি সংস্কারের এমনই মহিমা যে — "বিতরণ করা হয়নি এবং হিসাবের খাতা থেকে উধাও হয়ে গেছে — এমন খাস জমির মোট পরিমাণ ৩,৩৮,৩৯১.১৮ একর। অত্যন্ত রক্ষণশীল হিসাব ধরে বলা যায় এক একর জমিতে গড়ে বছরে ১০০০ টাকা আয় হলে, পড়ে থাকা ও উধাও হয়ে যাওয়া ঐ পরিমাণ জমি থেকে বছরে ৩৪ কোটি টাকার ফলন হওয়ার কথা। এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, যোগসাজসের ভিত্তিতেই এই বিশাল পরিমাণ জমি আত্মসাৎ করা হয়েছে।" (মুখার্জী ব্যানার্জী কমিশনের রিপোর্ট, পৃ-২৩)। কি বলবেন — সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের নেতা মন্ত্রীরা? গত ২৭ বছরে তাঁদের দলের নেতা-আমলা-জোতদাররা মিলিতভাবে ৯০০ কোটি টাকার জনগণের সম্পত্তি আত্মসাৎ করেছেন এবং এখনও সেই মহৎ কর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন।

আর এখন তো বুদ্ধবাবুদের রাজ্য সরকার জমির উর্ধ্বসীমা আইন তুলে দেবার চেষ্টা করছেন। ওদের প্রত্যক্ষ মদতে ও পরিকল্পনায় রাজ্যের কৃষি জমি দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেবার উদ্যোগ আয়োজন চলছে। ভেড়ি মালিক, চা বাগিচা মালিক, জোতদার-মহাজন, দেশি-বিদেশি পুঁজি — এদের শ্রীবৃদ্ধিই এখন সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের উন্নয়ন। এই উন্নয়নের নীল নকশার সাথে রাজ্যের অসংখ্য খেটেখাওয়া গরিব চাষী খেতমজুরের জীবনের সম্পর্ক কোথায়?

তাহলে আমরা কী দেখলাম? সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের নীতি কৃষকের জীবনে কোন শুভবার্তা বয়ে আনতে পারেনি। অভাবের দায়ে কৃষক জমি হারা হয়েছে, খেতমজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে; খেতমজুরের মাথাপিছু কাজের দিন কমার ফলে আয় কমেছে দ্রুত গতিতে — পরিণামে সন্তান সন্ততি নিয়ে অর্ধাহারে অনাহারে দিন অতিবাহিত করা ওদের প্রাত্যহিক রুটিনে পরিণত হয়েছে। অনাহারই এখন ওদের জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা। বুদ্ধবাবুরা মালিকদের উন্নয়নে এতই ব্যস্ত, এতই উচ্চকোটিতে তাঁদের অবস্থান, শিল্পপতিদের আয়োজিত পাঁচতারা হোটেলের কনফারেন্স রুমের খানাপিনাতে তাঁরা এতই মশগুল — বঙ্কিমচন্দ্র কথিত গ্রামবাংলার রামা কৈবর্ত-হাশেম শেখদের আর্তনাদ ওদের কানে পৌঁছতে পারে না। কেউ যদি কখনও এই আর্তনাদের খবর ওঁদের কানে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেন তবে বুদ্ধদেববাবুরা তাচ্ছিল্য ভরে বলেন — "এসব উন্নয়ন-বিরোধীদের ষড়যন্ত্র।' কালাহান্ডিতে গত বছর সাত জন হতভাগ্য অসহায় মানুষ পচা আমের আঁটি সিদ্ধ খেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলেন। খবরটা বিজেপি মন্ত্রীর কানে তুললে মন্ত্রীবর বলেছিলেন, — 'না খেয়ে মেরেনি, বিষক্রিয়ায় মারা গেছে।' আমলাশোলের ঘটনায় সিপিএম নেতা-মন্ত্রীদের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হয় এদের মধ্যে কী অদ্ভুত মিল! মালিকের পায়ে বিবেক বিসর্জন দিয়ে ক্ষমতার গদিতে টিকে থাকার রাজনীতি করলে এছাড়া অন্য কিছু হওয়া হয়তো সম্ভবও নয়।

পদ্মেরহাট হাসপাতালে ডেপুটেশন

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার জয়নগর থানার পদ্মেরহাট হাসপাতালে আলো-পাখার ব্যবস্থা করার জন্য বি পি এইচ সি-তে একটি ৩০ কি.ভি ক্ষমতার জেনারেটর বসানো হয়েছিল। কিন্তু সেই বিদ্যুৎ সংযোগে হাসপাতালের অফিস ঘরে ও ডাক্তার নার্সদের কোয়ার্টারে আলো পাখা চললেও, রোগীদের ঘরে শুধুই আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

এই সমস্যার কথা স্থানীয় হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির কাছে নাগরিকরা জানালে অতি দ্রুত কমিটির পক্ষ থেকে স্থানীয় মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি নিয়ে কমিটির সভাপতি আকবর মিস্ত্রির নেতৃত্বে এক জনপ্রতিনিধি দল ব্লক মেডিকেল অফিসার ডাঃ গোবিন্দ মণ্ডলের কাছে ১ জুলাই ডেপুটেশন দেন। বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে তিনি রোগীদের ঘরেও পাখা চালাবার দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে ডেপুটেশন

সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের মেদিনীপুর জেলা কমিটির আহ্বানে ক্রমবর্ধমান নারী নির্যাতনের ঘটনার প্রতিবাদে তিন শতাধিক মা-বোন গত ১৮ জুন তমলুক শহরে মিছিল করে জেলা পুলিশ সুপার ও জেলাশাসকের অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ও ডেপুটেশন দেন। আগে থেকে জানানো সত্ত্বেও জেলাশাসকের অফিসে যাওয়ার পথ বেড়া দিয়ে আটকে রাখায় মহিলারা রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখাতে বাধ্য হন। বিক্ষোভের চাপে পুলিশ বেড়া খুলে প্রতিনিধিদের ডেপুটেশনে নিয়ে যায়। প্রতিনিধিরা দাবি করেন, এগরায় কিশোরীর সকল ধর্ষণকারীকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, কিশোরী ও তার মায়ের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ধর্ষিতা কিশোরী এই বিক্ষোভে অংশ নেয় এবং প্রতিনিধিরা তাকে এস পি এবং এ ডি এম-এর সামনে উপস্থিত করেন। ডেপুটেশনে আরও দাবি রাখা হয় যে, মুগবেড়িয়ায় বর ও বরযাত্রীদের রাস্তায় আটকে রেখে বিয়ে বানচালকারী দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি দিতে হবে; নারী নির্যাতন, মদ, জুয়া, অশ্লীল সিনেমা ও পত্র-পত্রিকা বন্ধ করতে হবে; জীবনশৈলী শিক্ষার নামে যৌন ব্যাভিচারের শিক্ষা চালু করা চলবে না।

বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ লেখা রায়, সুনীতা গুপ্তা, কল্পনা দাস, শীলা দাস, লীলা শী, অসীমা পাহাড়ী, বেলা পাঁজা এবং জেলা সম্পাদিকা অনীতা মাইতি।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের বৈঠক

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র দৃষ্টিকোণ ও দাবি তুলে ধরলেন কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

আগামী কেন্দ্রীয় বাজেটের পরিপূর্ণ রূপদানের আগে মতবিনিময়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের ২৩ জুন আমন্ত্রণ জানান। ইউ টি ইউ সি-এল এসের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ভাইস প্রেসিডেন্ট কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী। তিনি এস ইউ সি আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটিরও সদস্য।

ইউ টি ইউ সি-এল এসের মতামত উপস্থাপনা করতে গিয়ে কমরেড চক্রবর্তী প্রথমেই এদেশের শ্রমিকশ্রেণীর জীবনে উদারীকরণ-বেসরকারীকরণ নীতির ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর প্রভাবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি দেখান যে, তথাকথিত আর্থিক সংস্কারের পথ অনুসরণ করার ফলে কৃষিতে ভর্তুকি প্রত্যাহৃত হয়েছে, বীজ ও সারের দাম বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিদ্যুতের দামও বেড়েছে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ছোট ও মাঝারি কৃষকরা বিপুল ঋণ করতে বাধ্য হচ্ছেন, যে ঋণ তাদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে পরিশোধ করা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। ফলে আর্থিক সংস্কারের সূচনা থেকেই চালু করা মুক্তবাজার অর্থনীতির ধাক্কায় কৃষকরা আজ দিশাহারা। এর ফলও দেখা যাচ্ছে ভয়ঙ্কর — অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্রের হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছেন। এমনকী পাঞ্জাব ও কেরালার কৃষকদেরও এই আত্মহননের মিছিল থেকে রেহাই মেলেনি। অপরদিকে, খোলা আমদানি নীতি ও ব্যাপক শুল্ক হ্রাসের ফল হিসাবে বড় বড় বিপুল ক্ষমতাধর বহুজাতিক কোম্পানীগুলির সাথে তীব্র প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পও আজ ধুঁকছে। আর এইসব রুগ্নশিল্পের সাথে যুক্ত হাজার হাজার শ্রমিকের জীবনেও সাথে সাথে নেমে এসেছে অনিশ্চয়তার তীব্র অন্ধকার। এর মধ্যে অনেক কারখানা ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে, যার ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ইতিমধ্যে চাকরি হারিয়েছেন। এইসব কর্মচ্যুত শ্রমিকরাও অবর্ণনীয় দুর্দশার মধ্যে পড়ে প্রায়শই বাধ্য হচ্ছেন আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে। সারা ভারত জুড়েই দৃশ্যটা এইরকম। পশ্চিমবঙ্গেও আলাদা কিছু নয়।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাবসর প্রকল্প (VRS) লক্ষ লক্ষ কর্মচারীকে বাধ্য করেছে চাকরি থেকে আগেই অবসর নিতে। শুধুমাত্র ব্যাঙ্কগুলোতেই এই প্রকল্পের দ্বারা ইতিমধ্যে দেড় লক্ষ কর্মচারীকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল, ১৩ লক্ষ ব্যাঙ্ক কর্মচারীর মধ্যে ৯ লক্ষকে বিদায় করা। এইভাবে স্বেচ্ছাবসর নেওয়ার ফলে সৃষ্ট শূন্যপদগুলিতে আর নতুন নিয়োগ করা হচ্ছে না, যাতে ধীরে ধীরে ঐ পদগুলিই বিলুপ্ত হয়ে যায়। সরকারি বীমাক্ষেত্র (এল আই সি এবং জি আই সি), রেল এবং অন্যান্য নানা সরকারি বিভাগেও একই ধরনের প্রকল্প রূপায়ণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ক্রমাগত বেসরকারীকরণ-বাণিজ্যিকীকরণের প্রক্রিয়ায় একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, যেগুলি একসময় জনগণের টাকায় তৈরি হয়েছিল, সেগুলিকে নামমাত্র মূল্যে বেসরকারি বৃহৎ মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। এই মালিকরা দাবি করছে, ইচ্ছামত নিয়োগ ও ছাঁটাই (হায়ার এ্যান্ড ফায়ার) করবার অধিকার। এরজন্য তারা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছে যাতে শ্রম-আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন ঘটিয়ে তাদের এই অধিকার দেওয়া যায়, যাতে তারা শ্রমিক ছাঁটাই-এর মাধ্যমে তাদের ভাষায় ঐ সব রুগ্ন শিল্পকে লাভের পথে ফিরিয়ে আনতে পারে।

তিনি এই বিষয়ে আরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, বিশ্বায়নের দৃষ্টিভঙ্গি 'কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের' ধারণা সম্পূর্ণ উল্টে দিয়েছে। ইতিপূর্বে একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র, মূলগতভাবে শোষণমূলক চরিত্র হওয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছিল, যাতে নাগরিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চাকরি ও চাকরিসাপেক্ষে বেকারভাতা দেওয়ার মতো কিছু অত্যাবশ্যক দায়িত্ব রাষ্ট্র পালন করতে পারে। কিন্তু বিশ্বায়নের ফলে সমস্ত দেশের সরকারই এই ধরনের সব দায়দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলছে। ফলে সমস্ত চাকরি, এমনকি সরকারি চাকরিকেও চুক্তি-ব্যবস্থার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। কমরেড চক্রবর্তী বলেন যে, দুঃখের কথা এই তথাকথিত সংস্কারের বিরুদ্ধে কার্যকরী প্রতিরোধ দেখা গেল না।

কেন্দ্রের নতুন ইউ পি এ সরকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি চাষীদের স্বার্থে, তাদের জীবনে কিছুটা স্বস্তি এনে দেওয়ার লক্ষ্যে, যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবছে, কমরেড চক্রবর্তী সেগুলিকে স্বাগত জানিয়েই বলেন, যত রিলিফই দেওয়া হোক না কেন, যদি সাধারণ মানুষের জীবনের দুঃখকষ্টের মূল কারণগুলি বিদ্যমান থেকেই যায়, আর্থিক সংস্কার প্রক্রিয়া যদি চলতেই থাকে, তবে সমস্যাও চলতেই থাকবে। এই সূত্রেই তিনি আরও দাবি করেন যে, বর্তমান সরকারের উচিত বিশ্বায়নের সমগ্র বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা ও এখনই বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO) থেকে বেরিয়ে আসা।

এরপর কমরেড চক্রবর্তী অবিলম্বে সরকারের বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত দাবিগুলি পেশ করেন,

১) পেট্রল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের বর্ধিত মূল্য এখনই প্রত্যাহার করতে হবে;
২) সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘটের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে;
৩) কর ব্যবস্থার সংস্কার সংক্রান্ত কেলকার কমিটির রিপোর্ট বাতিল করতে হবে, আয়কর সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের সীমা বাড়াতে হবে এবং ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বার্ষিক ১,৫০,০০০ টাকা আয় পর্যন্ত কর ছাড় দিতে হবে;
৪) বড় বড় শিল্প সংস্থার ক্ষেত্রে করবৃদ্ধি করতে হবে, বিভিন্ন শিল্প-সংস্থার কাছে প্রায় ১.৫ লক্ষ কোটি টাকার মতো অনাদায়ী ঋণ আদায়ের জন্য কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে এবং ঐ টাকা জনগণের বিভিন্ন কল্যাণমূলক ক্ষেত্রে ব্যয় করতে হবে;
৫) ভ্যাট চালু করা চলবে না;
৬) গ্রামের গরিব মানুষদের জন্য কাজের নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে এবং একটি জাতীয় কর্মনীতি প্রণয়ন করতে হবে;
৭) বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে স্বেচ্ছাবসর প্রকল্প ও নতুন চাকরির ক্ষেত্রে অন্তবর্তী স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করতে হবে;
৮) বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিল করতে হবে;
৯) রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি বিক্রির নীতি ত্যাগ করতে হবে এবং
১০) পি এফের ক্ষেত্রে সুদের হার ১২% পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে হবে।

১০০ দিনের কাজ

পাঁচের পাতার পর

১০০ দিনের কাজের সুযোগ এল তখন তাঁরা তার বিরোধিতা করছেন। এই প্রকল্প কার্যকরী হলে প্রয়োজনীয় অর্থের ৭৫ শতাংশ টাকা দেবে কেন্দ্রীয় সরকার, আর মাত্র ২৫ শতাংশ দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। গরিব মানুষের জন্য এই ২৫ শতাংশ টাকা খরচ করতেও নাকি তাঁরা অপারগ!

আসলে তাঁরা তো আজ বিশ্বায়নের রথের ঘোড়া। আর সেই রথের সওয়ারি করেছেন মালিকদের। তাঁদের কাছে মালিকদের উন্নয়নই আজ দেশের উন্নয়ন। রথের তলায় কোন্ জনগণ চাপা পড়লো, কার প্রাণ গেল — অত হিসাব এখন আর তাঁরা রাখতে রাজি নন। তাই মালিকদের কোটি কোটি টাকা ছাড় দিতে, ব্যবসায় ভর্তুকি দিতে, জল-বিদ্যুৎ-জমিতে ছাড় দিতে, তাঁদের টাকার অভাব হয় না। সম্প্রতি বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলায় গড়ে ওঠা আয়রণ কারখানার মালিকদের জন্য রাজ্য সরকার শুধু ২০০ কোটি টাকা ব্যাঙ্কঋণের ব্যবস্থা করেছে তাই নয়, ৬০ কোটি করে টাকা ভর্তুকি দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছে, যদিও কর্মসংস্থান সেগুলিতে নামমাত্র এবং শ্রমিকশোষণ চূড়ান্ত।

অন্যদিকে ক্ষমতায় বসে মালিকদের স্বার্থে সরকার পরিচালনার সাথে সাথে তাঁরা নিজেরাও আজ চূড়ান্ত বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন। মন্ত্রী-আমলাদের উচ্চ বেতন, বিদেশ ভ্রমণ, যতবার খুশি বিমান-ট্রেন ভ্রমণ, যত খুশি টেলিফোনের খরচ, ব্যয়বহুল বেসরকারি নার্সিংহোমে গোটা পরিবারের চিকিৎসা, এয়ারকন্ডিশন গাড়ি সহ নানা বিলাসব্যসনের পিছনে কোটি কোটি টাকা তাঁরা ব্যয় করছেন। এতে তাঁদের টাকার অভাব হয় না — অভাব হয় শুধু মুমূর্ষু মানুষগুলির বেঁচে থাকার মতো একটু কাজের ব্যবস্থা করার জন্য সামান্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করতে।

এই প্রকল্পের বিরোধিতা করার তাঁদের দ্বিতীয় কারণটি আরও চমকপ্রদ। সিপিএম নেতাদের বক্তব্য, একবার আইন হয়ে গেলে, যদি কোনও গরিব মানুষ এই প্রকল্পে ১০০ দিন কাজ না পান, তবে তিনি আদালতে যেতে পারেন। ফলে তখন এই ধরনের বহু মামলা জমবে। তার চেয়ে এই প্রকল্প চালু না হওয়া ভাল।

এই না হলে গরিব দরদ ! যদি দরিদ্র মানুষগুলিকে কাজ দেওয়ার ব্যাপারে তাঁরা আন্তরিক হতেন, তবে প্রথমেই প্রশাসনের চুরি-দুর্নীতি বন্ধ করে, মন্ত্রী-আমলাদের বিলাস-ব্যসনের অপব্যয় বন্ধ করে, পুলিশখাতে ব্যয় কমিয়ে ও অপ্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় বন্ধ করে তাঁরা এই টাকার ব্যবস্থা করতেন। এই বিপুল পরিমাণ অপব্যয় বন্ধ না করে হতদরিদ্র মানুষগুলির জন্য অর্থসংকটের কথা তোলা কি ভণ্ডামি নয় ? এর থেকেই বোঝা যায়, তাঁদের মুখে গরিব দরদের কথা আসলে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে মালিকশ্রেণীর স্বার্থে ও মদতে শাসনক্ষমতায় টিকে থাকার রাজনীতি ছাড়া কিছুই নয়।

অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি

তিনের পাতার পর

একটিকে অপরের বিকল্প হিসাবে খাড়া করে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা চালু করার যে ষড়যন্ত্র '৭৭ সাল থেকে বুর্জোয়ারা সফল করার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে, বর্তমানে তা বিজেপি ও কংগ্রেস দুই জোটের মধ্য দিয়ে অনেকটা কার্যকরী রূপ পেতে চলেছে। এরা উভয়েই বুর্জোয়াশ্রেণীর দল, এরা কেউই জনগণের জন্য কিছু করবে না। এদের উভয়েরই একটা অঘোষিত সাধারণ কর্মসূচি রয়েছে, যার প্রবর্তক কংগ্রেস। দেশি-বিদেশি একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থে রচিত সেই তথাকথিত সংস্কার কর্মসূচিই এদের মূল, যা বিজেপি বা কংগ্রেস যে জোটই ক্ষমতায় বসুক, তা রূপায়িত করবে। মালিকদের স্বার্থ দেখতে গিয়ে বিজেপি বা কংগ্রেস যে যখন ক্ষমতায় বসবে উভয়েই জনগণের ওপর শোষণ-দমন চালাবে; আবার ক্ষমতার বাইরে থাকলে জনস্বার্থের কথা বলে লোক ঠকাবে গদিতে বসার জন্য। দ্বিদলীয় ব্যবস্থার এইটেই মূল কৌশল। পার্থক্য শুধু এই যে, বিজেপি লোক ঠকাবে 'দ্রুত সংস্কার' এবং 'হিন্দুত্বের' ধুয়ো তুলে, কংগ্রেস লোক ঠকাবে 'ধীরে সংস্কার' 'সংস্কারের মানবিক রূপ' এবং 'ধর্মনিরপেক্ষতার' ধুয়ো তুলে। আঞ্চলিক দলগুলি তার তার সুবিধামতো এই দুই জোটের কোন একটায় যোগ দিচ্ছে, আবার সুবিধা বুঝে জোট বদল করছে। পাল্টাপাল্টি করে ক্ষমতা দখলের এই ঘৃণ্য খেলায় সিপিএম যোগ দিয়েছে কংগ্রেস জোটে, তাই কংগ্রেসের 'ধর্মনিরপেক্ষতা' এবং ন্যূনতম কর্মসূচির প্রশংসায় তারা পঞ্চমুখ। এভাবেই তারা আজ লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেশের মানুষ ও তাদের দলের কর্মী-সমর্থকদের ঠকিয়ে দেশি-বিদেশি বুর্জোয়াশ্রেণীর সেবা করছে। পার্লামেন্টে দু-চারটে বাড়তি সিট যা তারা পাচ্ছে তা মালিকশ্রেণীর একনিষ্ঠ সেবারই পুরস্কার।

প্রকাশিত হয়েছে

কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংগঠনগত সমস্যা

শিবদাস ঘোষ

প্রাপ্তিস্থান ঃ এস ইউ সি আই অফিস, ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

বন্ধু সেজে গরিবের বুকে ছুরি চালাচ্ছে সি পি এম সরকার

একের পাতার পর

প্রথম ৪ কিমি স্টেজে ভাড়া না বাড়ানোয় মালিকরা প্রতিবাদে সোচ্চার। বাস মালিকদের যুক্তি, প্রথম স্টেজে যেহেতু সবচেয়ে বেশি যাত্রী যাতায়াত করে, তাই প্রথম স্টেজে ভাড়া না বাড়ায় তাদের লোকসান হবে। বাসমালিকদের এ কথা কি সত্য ? বহু আগেই রাজ্য সরকার যাত্রীদের ঠকিয়ে বাসমালিকদের অধিক মুনাফা পাইয়ে দিতে পুরানো স্টেজ প্রথা ভেঙ্গে দিয়ে দূরত্ব কমিয়ে কিলোমিটার ভিত্তিক ভাড়া চালু করেছে। কিলোমিটারভিত্তিক প্রথায় প্রথম স্টেজ যখন ছিল ৬ কিমি পর্যন্ত, তখন প্রথম স্টেজে যাত্রী সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল। পরবর্তী স্টেজগুলি ছিল প্রতি ৬ কিমি অন্তর। এখন ৪ কিমি পর্যন্ত প্রথম স্টেজ করা হয়েছে এবং তার পরবর্তী স্টেজগুলি করা হয়েছে ৪ কিমি অন্তর। এর ফলে যাত্রীদের বাড়তি ভাড়া যেমন দিতে হচ্ছে, তার উপর স্টেজ ছোট করার জন্য বাড়তি স্টেজের ভাড়াও গুণতে হচ্ছে। বাসমালিকরা এক্ষেত্রে ডবল লাভ করছে। এর উপর আছে দূরত্বের কারচুপি। সরকার কিলোমিটার মেপে দূরত্ব চিহ্নিত করে দেয়নি। বাসমালিকরা মর্জিমত তা স্থির করেছে। এ ব্যাপারে আর টি এ-র সাথে মালিকদের যোগসাজসের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিভিন্ন রুটে বাস যাত্রীদের সঙ্গে বাসকর্মীদের কিলোমিটার ভিত্তিক দূরত্বের মাপকে কেন্দ্র করে নিয়মিত বিরোধ, মারামারি পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে বাসমালিকদের উপরি যে লাভ তার অঙ্কও কম নয়।

রাজ্য সরকার বাস মালিকদের স্বার্থ রক্ষায় কত তৎপর তা আর একটা ঘটনা থেকে অত্যন্ত নগ্ন হয়ে যায়। এর আগে তেলের দামবৃদ্ধির অজুহাতে ভাড়া বাড়ানোর সময় পরিবহনমন্ত্রী তেলের দামের জন্য বাড়তি ভাড়া ছাড়াও অতিরিক্ত ৯ শতাংশ ভাড়া বাড়িয়েছিলেন যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যের নাম করে। অর্থাৎ বাসমালিকরা যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা কিছু করার আগেই তাদের এই খাতে আগাম বাড়তি টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই বাড়তি টাকা গত কয়েক বছর ধরে কিছু না করেই বাসমালিকরা জনসাধারণের পকেট কেটে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ যাত্রীদের সমস্যা, দুর্ভোগ সমাধানে কণামাত্রও উদ্যোগ নেই। বেশিরভাগ বাসের জানালা ভাঙা, ছাদ দিয়ে জল পড়ে, বসার আসনগুলো নড়বড়ে, দেড়জনের বসার জায়গায় দু'জন বসিয়ে নিয়ে যাওয়া, তার সাথে আরও হরেক রকমের সমস্যা। বাসপরিবহনের যেমন কোন শৃঙ্খলা নেই, গতিরও কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। বাড়তি যাত্রী তোলার জন্য বাস কখনো শম্বুক গতিতে চলে, আবার প্রতিদ্বন্দ্বী বাসকে টপকে যাত্রী তোলার জন্য প্রয়োজনে ঝড়ের গতিতে চলে। ট্রাফিক পুলিশ ঘুষ খেয়ে নীরব জগন্নাথ। এখন আবার সরকারের খুবই টাকার অভাব, তাই ট্রাফিক সার্জেন্টদের মাসিক একটা বিপুল অঙ্কের টাকার কোটা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে, সেই টাকা সরাসরি আদায়ের জন্য স্পট্ ফাইন করা হয়েছে। ট্রাফিক সার্জেন্টরা এই জরিমানার টাকা তুলতেই ব্যস্ত। যান নিয়ন্ত্রণে শৃঙ্খলা আনার কাজ যেন তাদের নয়, অন্য কারও। ফলে যাত্রীদুর্ভোগ বাড়ছে, দুর্ঘটনা বাড়ছে। স্পট ফাইনের মারফত আর যত অপরাধ বাড়ছে, সরকারের আয়ও তত বাড়ছে। কাজেই পরিবহনমন্ত্রী এসব দেখেও দেখেন না। রাজ্যে যে একজন পরিবহনমন্ত্রী আছেন এবং তাঁর একটা দপ্তর আছে, এ কেবল বাসভাড়া বাড়ানোর সময় রাজ্যের মানুষ জানতে পারেন, অন্য সময় জানা যায়না।

প্রতিবার ভাড়াবৃদ্ধির সময় সেই অতি পরিচিত নাটকের পুনরাভিনয় হয়, যেমন এবারেও হচ্ছে। রাজ্য সরকারের ভাড়াবৃদ্ধি বাসমালিকরা কোনমতেই মানা সম্ভব নয় বলে হুমকি দেয়, বাস ধর্মঘটের ডাক দেয়। এদিকে পরিবহনমন্ত্রীও 'রণংদেহি' হুঙ্কার দেন, যেন জনস্বার্থ রক্ষার জন্যই তিনি এ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। মনে হবে, মালিকদের চাপের কাছে তিনি কোনমতেই আত্মসমর্পণ করবেন না। শেষপর্যন্ত হয় বাসমালিকরা ধর্মঘট তুলে নেয়, না হয় একদিনের একটা প্রতীক ধর্মঘট করে ভাড়াবৃদ্ধি মেনে নেয়। সরকারের সঙ্গে বাসমালিকরা বোঝাপড়া করেই প্রতিবার এ নাটক করে যাত্রীদের ঠকানোর জন্য, যাতে জনগণকে দিয়ে বর্ধিত ভাড়া সরকার গ্রহণ করিয়ে নিতে পারে। যেন জনসাধারণ মনে করে, সরকার শেষপর্যন্ত চেষ্টা করে যতটুকু ভাড়াবৃদ্ধি না করলেই নয়, শুধু সেটুকুই করেছে। চালাকি আর কাকে বলে ! এ সবটাই সাজানো। বুর্জোয়া দলগুলিও মালিকদের স্বার্থই রক্ষা করে, কিন্তু এত ধূর্ততার সাথে বাইরে গরিবের বন্ধু সেজে এত মসৃণভাবে গরিবের বুকে ছুরি চালাতে তারা পারেনা। কিন্তু জনসাধারণ এ চালাকি ধরে ফেলেছে।

এভাবে দফায় দফায় ভাড়া বৃদ্ধির চাপে বিপর্যস্ত যাত্রী সাধারণ প্রবল ক্ষুব্ধ। কিন্তু সরকারের চরিত্র ধরতে পেরেও যেহেতু তাঁরা অসংগঠিত, তাই বাধা দিতে অপারগ হয়ে অন্যায় ভাড়াবৃদ্ধি মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছেন। যেসব জেলায় বাসযাত্রীরা কিছুটা সংগঠিত হতে পেরেছেন, সেখানে বাড়তি ভাড়া সবক্ষেত্রে চালু করতে পারেনি মালিকরা। গত ১-৪-২০০৩ কলকাতা ও শহরতলির জেলাগুলিতে বাসভাড়া বাড়লেও মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ জেলায় বাসভাড়া বাড়াতে পারেনি মালিকরা এস ইউ সি আই-এর আন্দোলন ও যাত্রী প্রতিরোধের চাপে। এবারেও ন্যূনতম ভাড়া সরকার যে ৩ টাকা রাখছে, সেটাও প্রতিবার বাসভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই'র নেতৃত্বে যতটুকু আন্দোলন হচ্ছে তার চাপেই তাকে রাখতে হচ্ছে। এটা না থাকলে সেটাও তারা করতনা।

১৯৭৭ সালে সিপিএম ক্ষমতায় আসার আগে দীর্ঘ কংগ্রেস শাসনকালে আজকের মত ঔদ্ধত্য বাসমালিকরা দেখাতে পারেনি। যাত্রীদের ঘাড়ে বাড়তি ভাড়া চাপাবার দাবি তুলে বাসমালিকরা মিটিং, মিছিল করছে, বুক ফুলিয়ে ধর্মঘটের হুমকি দিচ্ছে, ধর্মঘটও করছে — এমন জিনিস কল্পনাও করা যেত না সেসময়। কারণ, তখন গণআন্দোলন ছিল, লড়াই ছিল, যাকে ভয়ের চোখে দেখত মালিকরা। তখন ভাড়া বাড়াতে হলে সরকারকে জনমতকে সমঝে চলতে হত। সিপিএম ২৭ বছরের শাসনে গণআন্দোলনের কোমরকেই ভেঙ্গে দিয়েছে শুধুমাত্র মালিকদের সেবা করে সরকারি ক্ষমতার বিলাসভোগ করার জন্য। তাই অন্যান্য সকল শিল্পের মতই পরিবহন শিল্পের বেসরকারী মালিকরাও আজ বেপরোয়া। মুষ্টিমেয় বাসমালিকদের হাতে লক্ষ লক্ষ যাত্রীরা আজ বন্দী, বাস কর্মচারীরাও মালিকী বঞ্চনার শিকার।

কংগ্রেস নেতা বিধান রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বকালে ১ পয়সা ট্রামভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে কলকাতায় তুমুল আন্দোলন হয়েছিল। আন্দোলনের চাপে বিধান রায় বাড়তি ভাড়া প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেদিন জ্যোতিবাবু বিরোধী নেতা হিসাবে বলেছিলেন, এক পয়সা ভাড়াবৃদ্ধি বড় কথা নয়, এই পয়সা কার পকেট থেকে কার পকেটে যাচ্ছে সেটাই বড় কথা। অর্থাৎ যাত্রীদের পয়সা ব্রিটিশ মালিকদের পকেটে যাচ্ছে, তাই আন্দোলন।

আর আজ ভাড়া তো ১ পয়সা হারে বাড়ছে না, ৫০ পয়সা, ১ টাকা হারে বাড়ছে। এই টাকা গরিব যাত্রীদের পকেট থেকে যাচ্ছে দেশিয় মালিকদের পকেটে। দেশিয় মালিকরা বেশি শোষণ করলেও আজ আর সিপিএমের আপত্তি নেই। বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির শোষণেও এখন অবশ্য আপত্তি আর তাদের নেই, বরং তারা তো বিদেশি পুঁজিকে আবাহনই করছে। কারণ ২৭ বছর এই মালিকদের দাক্ষিণ্যেই রাজ্যের ক্ষমতায় সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার আছে এবং তারা জানে দেশিবিদেশি মালিকদের সেবা করলেই সরকারে থাকা যাবে।

প্রশ্ন হচ্ছে, জনগণ কি বছরের পর বছর এই প্রতারণা মেনে নেবেন ? নাকি একে প্রতিহত করার জন্য সঠিক নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী শক্তিশালী আন্দোলনের পথে এগিয়ে আসবেন ?

সুন্দরবনের নদীবাঁধ ভাঙন

নেতা-মন্ত্রীদের সত্যিই কি কোন উদ্বেগ আছে

বর্ষার শুরুতেই রাজ্যের বিশেষত সুন্দরবন এলাকার নদীবাঁধগুলি ভাঙতে শুরু করেছে। প্লাবিত হতে শুরু করেছে এলাকার পর এলাকা। মাঠের সব্জি, পানের বরজ, পুকুরের মাছ, ঘরবাড়ি লোনাজলের কবলে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। দেখা দিয়েছে পানীয় জলের সঙ্কট। মানুষের পাশাপাশি গবাদি পশুও বিপন্ন।

গ্রাম বাংলার এই চিত্র কিন্তু নতুন কিছু নয়। এটা ফি বছরেরই চিত্র। এবং প্রতি বছরই বর্ষা এলে এবং নদীবাঁধ ভাঙতে শুরু করলে সরকার ও মন্ত্রীরা 'উদ্বেগ' প্রকাশ করেন; নদীবাঁধ মেরামতির জন্য কিছু টাকা মঞ্জুর করেন। বাস্তবে সেই টাকায় কাজের কাজ বিশেষ কিছুই হয়না, বাঁধ ভাঙ্গে, লোনাজলে এলাকার পর এলাকা প্লাবিত হয়, মানুষ সর্বস্বান্ত হয়।

যখন গ্রীষ্মকাল, তখন এ সংক্রান্ত কোন উদ্যোগই সরকার গ্রহণ করেনা। অপেক্ষায় থাকে বর্ষা ও ভাঙ্গনের জন্য। বর্ষা আসবে, নদীগুলি ফুলে ফেঁপে উঠবে। সরকারি চরম অবহেলার কারণে নদীবাঁধগুলি ভাঙ্গবে। মানুষের সর্বস্ব ভাসবে। আর তখনই উদ্বেগ প্রকাশ করে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন সরকারের নেতা ও মন্ত্রীরা। তাঁরা প্লাবিত এলাকায় ছুটবেন ও তাঁদের পিছন পিছন ছুটবে টিভি ক্যামেরা। ক্যামেরার সামনে নেতা-মন্ত্রীরা মাথায় করে দু-এক ঝুড়ি মাটি বইবেন; টিভিতে দেখানো হবে, ধন্য ধন্য পড়ে যাবে। (গত বছরেই আমরা সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রীকে দেখেছিলাম পাথরপ্রতিমায় গিয়ে মাটি বইতে।) সেই সঙ্গে টাকা মঞ্জুর হবে। সেই টাকার ভাগ যাবে রাইটার্স থেকে স্তরে স্তরে গ্রামের ঠিকাদার পর্যন্ত। এরপর যা থাকে তা দিয়ে নদীর বাঁধের কাজ। ১০ ঝুড়ি মাটির কাজ খাতায় হিসাবে হয়ে যায় ১০০ ঝুড়ি। এত মাটি কোথায় গেছে? জবাবও পরিষ্কার — ফুলেফেঁপে ওঠা নদীর জল সব মাটি টেনে নিয়ে গেছে। ফলে সেই মাটির হদিস আর মেলে না। ব্যাস, হয়ে গেল সুন্দরবন উন্নয়নের কাজ!

এইভাবে জনগণকে সর্বনাশের ঘূর্ণাবর্তে ফেলে চলে মুনাফা লোটার পালা। এবং বলাবাহুল্য সরকার ও মন্ত্রীরা সেই অমোঘ সুযোগটা করে দেন। ফলে নদীবাঁধ ভাঙ্গার সংবাদে তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ আসলে লোকদেখানো। বাস্তবে জনগণের প্রতি তাঁদের দরদবোধের কোন পরিচয় মেলেনা।

এবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলাশাসক জানিয়েছেন — সুন্দরবনে নদীবাঁধের কাজ হবে 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের' সাহায্যে এবং ইতিমধ্যে নাকি ২ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকার চাল বিভিন্ন ব্লকে বন্টন করে দেওয়া হয়েছে। মজুরের ক্ষেত্রে ৫০ ভাগ নগদ টাকা এবং বাকি ৫০ ভাগ চাল হিসাবে দেওয়া হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বাঁধের কাজ করবে গ্রামবাসীরাই। তাহলে দুর্নীতি কোথায়? দুর্নীতি আছে বৈকি এবং তা যে হবেই — সেকথা কোন সন্দেহ না রেখেই বলে দেওয়া যায়। কেননা, এ ধরনের কাজ নতুন কিছু নয়। কংগ্রেস আমলের 'টেস্ট রিলিফের' অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে তাঁরা জানেন, 'পে-মাস্টার'রা ডান-হাত বাঁ-হাতের টিপছাপ দিয়ে, বাড়ির ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী প্রভৃতির হাতের আঙুলের টিপছাপ নিয়ে তৈরি করত 'মাস্টার রোল'; অথচ তাতে লেখা থাকত শ্রমিক গ্রামবাসীদের নাম। তারাই যেন কাজ করার বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিয়েছে টিপছাপ দিয়ে। বাস্তবে যে সংখ্যক লোক কাজ করত, খাতায় দেখানো হত তার কয়েকগুণ বেশি শ্রমিকের নাম। পে-মাস্টার এবং তার নিয়োগকর্তার পকেট ভরে উঠত। আবার এমনও হয়েছে যে, কোনও কাজ না করেই স্রেফ টিপ-ছাপে ভর্তি হয়ে যেত মাস্টার রোল; সমূহ অর্থই চলে যেত দুর্নীতির পথে। সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে' যেন তারই প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তাহলে সুন্দরবনের মানুষকে রক্ষা করার কী হবে? জেলাশাসক সম্প্রতি শুনিয়েছেন, ''প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্যে পূর্ণাঙ্গ 'ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান' রূপায়ণ করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে'' (আনন্দবাজার পত্রিকা ১৫-৬-০৪)। শুনে মনে হবে — কী চমৎকার! এবার সুন্দরবনবাসীর মুশকিল আসান হল বুঝি! কিন্তু মজা হচ্ছে, সব প্ল্যানই নেওয়া হচ্ছে বর্ষাকালে। ফলে তার হিসেবের অঙ্ক আমাদের জানা। সে কারণে, জীবনজীবিকা ফসল চাষবাস বাঁচাতে গেলে সুন্দরবন অঞ্চলের ভুক্তভোগী জনগণকে আন্দোলনের পথ ধরতেই হবে। সংগঠিত গণআন্দোলনের চাপে সরকার ও তার প্রশাসনের গ্রীষ্মকালেই কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করতে হবে। দাবি তুলতে হবে, সরকারি অবহেলা ও অপদার্থতায় নদীবাঁধ ভেঙ্গে এলাকা প্লাবিত হলে, সমস্ত ক্ষতিপূরণ সরকারকে দিতে হবে। আন্দোলনের এই পথ ছাড়া বাঁচার সত্যিই কোন বিকল্প নেই। সরকারি দয়া-দাক্ষিণ্য, উদ্বেগ ও শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করে থাকলে জনগণের দুর্দশার লাঘব হবেনা।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net